COSMOS
GREENCITY
BARASAT
Buy Plot in EMI
Call: 9051285489

কিচির মিচির

আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক চর্চাকেন্দ্র
PANTAR
যোগাযোগ : ৯৪৭৭৮ ০৭০৭৭,
৯৪৩৩২৬৪৩৯৪

১ বর্ষ ৩ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১৫ মে ২০১৪, ৩১ বৈশাখ ১৪২১ | মোট ১২ পাতা | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

বাঘবনের কাহিনি

শৈবাল দাশ

‘পায়ে পড়ি বাঘ মামা,
তুমি যে কোথায় কে তা জানতো ...’

‘উফ্! বুম্বার এক চিমটি খেয়ে হারু চুপ। চাপা গলায় বুম্বার ধমক, ‘জানো না জঙ্গলে কথা বলা বারণ।’

‘ওহ্, তাই তো।’ হারু মামা ভাগ্নের শাসনে ফিক্ করে হেসে বলে, ‘ভাবলাম, একটু ভুল গেয়ে ফেলেছি তাই চিমটি কাটলি, সরি, সরি।’ মামা-ভাগ্নের ছোট্টো খুনসুটি আমিও উপভোগ করি। আসলে হারুর দোষ নেই, ভোর থেকে কানহা’র জঙ্গলে সাফারি চলছে। এক ঘণ্টা রাউন্ড হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি কই? বুম্বা অনেকদিন বায়না করছিল, ‘জেঠু এবার তোমার সঙ্গে জঙ্গলে নিয়ে যেতেই হবে। জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলের গল্প শুনবো, বাঘের খোঁজ করবো।’ পরীক্ষা শেষ, হাতে বেশ লম্বা ছুটি, তাই বেরিয়ে পড়লাম ওদের নিয়ে জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারে।

গোন্ডিয়া স্টেশনে নেবে দেড়শো কিমি গাড়িতে চেপে যখন দারুণ পথশোভা দেখতে দেখতে জঙ্গল লাগোয়া একটি রিসর্টে পৌঁছালাম তখন সূর্যটা লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে জঙ্গলের গাছের ফাঁকে। ‘কী দারুণ জায়গা গো, পাঁচিল টপকে বাঘ ঢুকে পড়বে নাতো? ওই দেখ্ পাকা ফলগুলো সবুজ পাখিটা কেমন ঠুকরে খাচ্ছে, ওটা কি পাখি’- বুম্বার হরেক প্রশ্ন। বসন্তের শেষ বিকেলে তখন অনেক অনেক চেনা-অচেনা পাখির ঝাঁক, যে যার বাসায় ফিরে যাবার তাড়া।

চান-টান সেরে কটেজের বাইরে এসে বসলাম সব্বাই মিলে, সামনে গরম পকোড়া

(এরপর ২ পাতায়)

বাঘ মামা!

ছোটোবেলা থেকে যত বাংলা গল্প, কবিতা পড়েছি সব জায়গাতেই বাঘকে বাঘ মামাই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের কথা। অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় ‘পায়ে পড়ি বাঘ মামা’। কিন্তু বাঘের সঙ্গে মামার কী সম্পর্ক তা কোথাও সে অর্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র উপেন্দ্রকিশোরের লেখা টুনটুনির বইতে বলা আছে ‘বাঘ কিনা মামা, আর শিয়াল কিনা ভাগ্নে।’ অর্থাৎ বাঘ তোমার আমার মামা নয়, বাঘ হলো শিয়ালের মামা। বাঘ যখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তখন শিয়াল তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, আসলে বাঘ শিকার করে যে উচ্ছিষ্ট ফেলে যায় তাতে ভাগ বসানোর জন্য। সেখান থেকেই বাঘ হয়ে গেল সবার মামা।

বনের রাজা

দেবব্রত দাশ

গেট খোলা মাত্র সামনে-পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পঁয়তাল্লিশটা হুডখোলা ‘জিপসি’র ইঞ্জিন প্রায় এক সাথে গর্জন করে উঠল। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই জিপসিগুলো বিশাল গেট পার হয়ে ‘বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ’-এর অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। মাসটা নভেম্বর। আরও ঠিকঠাক-এগারোই নভেম্বর। সময় সকাল ছ’টা। সূর্য সবে মাত্র দিগন্ত রেখার ওপরে উঠেছে। বাতাসে ভাসমান বিন্দু বিন্দু জলকণা হালকা কুয়াশা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বনভূমির সর্বত্র। শীতের কামড় থেকে বাঁচতে জিপসির প্রায় সব বয়সি আরোহীই উলের সোয়েটার অথবা পুলওভার, এমনকী চামড়ার জ্যাকেটও চাপিয়ে নিয়েছে গায়ে। কান-মাথা ঢেকে মাফলার জড়ানো কারোর, আবার কারোর বা মাথায় টুপি। জয়তীকে নিয়ে বিমলেন্দু জিপসির পেছনের সিটে বসেছেন। বিমলেন্দুর বাঁ পাশে একেবারে প্রান্তে গাইড রাকেশ সিং, ওদের সামনে, ড্রাইভারের ঠিক পেছনের আসনে বিমলেন্দু-জয়তীর ছেলে চন্দ্রিল আর তার স্ত্রী বিতস্তা। পুরো জিপসিটা সাতশো আশি টাকায় বুক করতে হয়েছে। এছাড়া গাইডের জন্য দিতে হয়েছে দেড়শো টাকা।

বাঘের মাসি!

বেড়াল বাঘের কেমন মাসি? বৈজ্ঞানিকরা সমস্ত প্রাণিকেই কোনও কোনও ফ্যামিলিতে ভাগ করেছেন। বাঘ যে ফ্যামিলির সদস্য তার নাম ‘ফেলিডে’ (Felidae)। এই পরিবারে অনেক সদস্য আছে। ফেলিডে পরিবারটি আবার দুটি উপপরিবারে বিভক্ত - প্যান্থেরিনে (Pantherinae) আর ফেলিনে (Felinae)। এই প্যান্থেরিনে পরিবারের অন্যতম সদস্য বাঘ। এছাড়াও রয়েছে সিংহ, লেপার্ড, জাগুয়ার। এদের গণ বা জেনাস এক - প্যান্থেরা। কিন্তু প্রজাতি আলাদা। ফেলিনে পরিবারে রয়েছে পুমা, চিতা, সারভাল, বেড়াল, লিংকস্ প্রভৃতি। এদের গণও আলাদা, প্রজাতিও আলাদা। এদের মধ্যে বেড়াল আর চিতা ছাড়া সবাইকেই আমরা বনবেড়াল বলি। সম্পর্ক হিসেবে দেখতে গেলে বেড়াল অবশ্যই বাঘের দূর সম্পর্কের মাসি।

(এরপর ৩ পাতায়)

বাঘবনের কাহিনি

সংখ্যায় ৫৩টি

সারা ভারতে মোট ৫৩টি টাইগার রিজার্ভ রয়েছে। এই প্রতিটি টাইগার রিজার্ভ কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি পরিচালিত প্রজেক্ট টাইগারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর বাইরে আরো ৬টি অরণ্যকে টাইগার রিজার্ভ হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রয়েছে।

বৃহত্তম

অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনসাগর-শ্রীশৈলম ব্যাঘ্র প্রকল্পটি দেশের মধ্যে সবথেকে বৃহত্তম। এর আয়তন ১,৩৭৮ বর্গ মাইল বা ৩,৫৬৮ বর্গ কিলোমিটার।

মাত্র ১,৭০৬

ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি'র হিসাব অনুযায়ী ভারতে এখন বাঘের সংখ্যা মাত্র ১,৪১১টি। যদিও এখানে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সব বাঘের হিসেব ধরা নেই। এই তথ্য ২০০৮ সালের। ২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী বাঘের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০৬টি।

বাংলায় দুই

পশ্চিমবঙ্গে দু'টি টাইগার রিজার্ভ রয়েছে। সে দু'টি হল উত্তরবঙ্গের বক্সা টাইগার রিজার্ভ এবং দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প।

রাজকীয় মুন্না

সেরা এবং ভাল

ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি'র সূত্রানুযায়ী তাড়োবা, জিম করবেট, কানহা, বান্ধবগড়, বন্দীপুর, মদুমালাই, পেঞ্চ, নাগাজিরা, নাগারহোল ও দুধওয়া টাইগার রিজার্ভ 'এক্সসেলেন্ট', রাজ্যের সুন্দরবন 'ভেরিগুড' এবং বক্সা 'গুড' তালিকায় রয়েছে।

(১ পাতার পর)

আর চা। হারু বিকেলের দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাতেই বললাম, 'ভায়া, কাল কিন্তু জঙ্গলের ভিতর এসব চলবে না, আর তোমার ওই খুশবুদার পারফিউম আর বার করবে না। এই দু'টোই কিন্তু প্রাণিকূলকে খুব কষ্ট দেয়। এই সবুজ প্রকৃতিতে আমরা ওদের গন্ধ পেতে এসেছি, দিতে নয়।' ট্যাঁ..ও, ট্যাঁ.....ও, ট্যাঁও, দূরে কোথাও ময়ূর ডেকে উঠল। সন্ধ্যা নেমেছে একটু আগেই, তবুও বেশ আলো-আলো নরম ভাব। আসলে কাল পূর্ণিমা তাই আজ এত পরিস্কার দৃশ্যপট। বুম্বা আমার কাছে এসে বসলো। প্রায় একশো মিটার দূরে কটেজের রান্নাঘরে টুংটাং আওয়াজ ভেসে আসছে। রাতের রান্না তৈরি হচ্ছে। ফাঁকা অরণ্যে যে কোনো আওয়াজই খুব কাছের মনে হয়।

'কতদিন আগের এই জঙ্গল গো জেঠু?' বুম্বার দিদি টুসুর প্রশ্ন এবার।

অরণ্যতো আদিম, এর কোনো নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ হয় কি? তবে হ্যাঁ, মধ্যপ্রদেশের মৈকল পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত কানহার এই অরণ্য ১৯৫৫ সালে জাতীয় উদ্যান হিসাবে গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে প্রায় ১,৯৪৫ বর্গ কিমি জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠে টাইগার রিজার্ভ।

'অর্থাৎ বাঘেদের মুক্তাঞ্চল' হারু বলে ওঠে। 'আমাদের খাবার মজুত থাকবে যথেষ্ট, আমরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াবো বুক ফুলিয়ে, শিকার হয়ে যাবার নো চিন্তা। মানুষের দল আসবে আমাদের ডেরায়, দেখবে, ছবি নেবে পটাপট আবার ফিরে যাবে এলাকা ছেড়ে ... তাই না?'

'আজ্ঞে নো স্যার, মহারাজের দর্শন পাওয়া অত সহজ নয়, যাকে বলে চেষ্টা+ভাগ্য=ফল। তবে হ্যাঁ, এর ভেতর থাকে ভরপুর রোমাঞ্চ।' আমার উত্তরে হারুকে কতটা উৎসাহিত করল বুঝলাম না। আসলে রিজার্ভ ফরেস্টের এই অরণ্যগুলোকে দু'টো এরিয়ায় ভাগ করা থাকে। একটা 'কোর এরিয়া' আর একটা 'বাফার জোন'। আর ওই কোর জোনের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় হুডখোলা জিপসি গাড়ি ও গাইড নিয়ে ঘোরার জন্য টিকিট নিয়েই ঢুকতে পারা যাবে। আর সেখানেই বন্যদের অবাধ যাতায়াত। তবে কোনো বন্য প্রাণি এই আইন পরোয়া করে না। তাদের ইচ্ছে হলে কোর এরিয়া ছেড়ে বাফার জোনে যে কোনো সময়ই ঢুকতে পারে। এইতো কিছুদিন আগেই এই রিসর্টের বাইরে প্রায় ১ কিমি দূরে বাঘ এসে এমন হালুম-হালুম করেছিল রাতে, যে অনেকেরই ঘুম পগার পার।

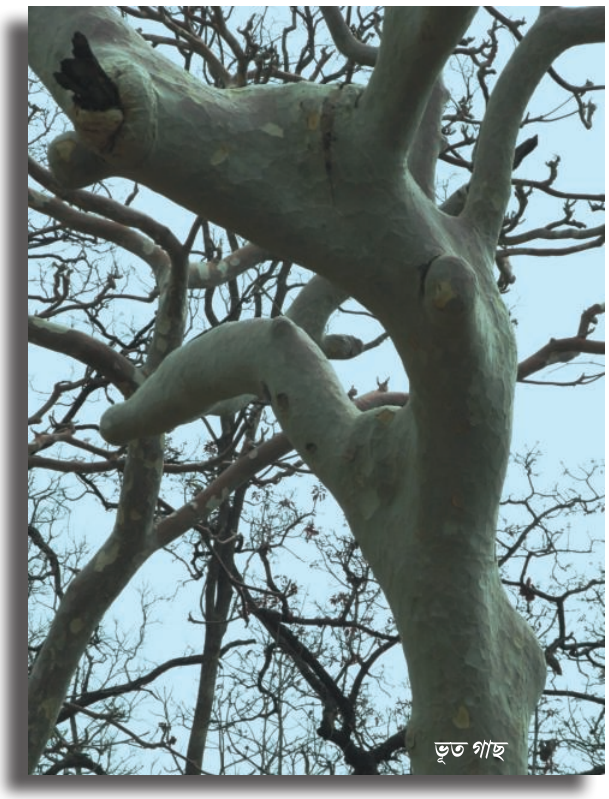

ভূত গাছ

হঠাৎ দেখি দুটো আলো দ্রুত দূর থেকে এগিয়ে আসছে, ব্যাপার কী! রিসর্টের দুজন কর্মচারী উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে আসে 'সাব জলদি চলিয়ে, ভালু আজু য়া হ্যায়'। কোনো কথা না বলে নিমেষে তাদের অনুসরণ করলাম। রিসর্টের একদম শেষ প্রান্তে, একটা উঁচু পাঁচিলের এ প্রান্তের গাছের পাকা পেঁপে - ওদিকের একটা গাছে উঠে হাত বাড়িয়ে চলছে এন্তার চাকুম চুকুম ..., এক মিশকালো ভালুকের কি দারুণ ভুরিভোজ দৃশ্য। চোখে আলো লাগতেই আর আমাদের দেখতে পেয়েই পাকা চোরের মতো নিমেষে হাওয়া। ভাল্লুক কিন্তু জঙ্গলের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণি, এখানে অনেক লোক ছিল বলে পালিয়ে গেল বটে, একা বা দু'জনে থাকলে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারত। জঙ্গলের এই এক প্রাণি, যে কিনা বিনা প্ররোচনায় অ্যাটাক করতে পারে। এখানকার এক জঙ্গলকর্মী কার্তিকেয়নের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ডিউটি শেষ করে জঙ্গল পথ ধরে ফিরছিলেন একবার। আচমকা, ভাল্লুকের খপ্পরে পড়ে গেছিলেন। মারাত্মক লড়াই হয়েছিল তাদের মধ্যে, হাতের সামান্য একটা লাঠিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে চলে এক অসম লড়াই। বীভৎস জখম করে ভাল্লুক তাকে মরে গিয়েছে ভেবে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মৃতপ্রায় কার্তিকেয়নকে পরে উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ ছ'মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসা ভদ্রলোকের মাথাটা দেখলে আজও শিউরে উঠতে হয়। বাঘ এরকম আচরণ করে না। রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ বড়োজোর ভয় দেখায়, চার্জ করে।

'তাহলে কী দরকার বাপু এসব ডেঞ্জার জায়গায় এসে?' হারু বলে।

'কী দরকার রোপওয়েতে চড়ে, কী দরকার পাহাড়ে উঠে? ... তুমি মামা, বরং চিড়িয়াখানায় যাও বাঘ দেখতে। ঘেরাটোপে নো রিস্ক। হা হা ...' বুম্বা আবার যুক্তি সাজায়।

সত্যি, বিপদতো সর্বত্র হতে পারে তাই বলে সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় কি? রুটইয়ার্ড কিপলিং তাইতো তার বিখ্যাত গল্প 'জাঙ্গল বুক'-এ কানহার সুন্দর পটভূমি জুড়ে দিয়েছিলেন, আমাদের অতি প্রিয় চরিত্র মুংশীর সঙ্গে। কানহা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের সব বিখ্যাত টাইগার রিজার্ভের সঙ্গে সেই গল্প সত্যিই দারুণ, তাই না বুম্বা?'

'একদম ঠিক বলেছ জেঠু, ওই বইটা আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি' বুম্বার সগর্ব ঘোষণা।

পনির মাখনি আর রুটি সহযোগে রাতের খাবার শেষ করে উঠলাম। তখন প্রায় ৯টা। অরণ্যে গভীর রাত। চাঁদের আলোয় তখন লুটোপুটি খাচ্ছে বন জ্যোৎস্না। আচমকা ভুত, ভুতুম ... ভুম্ শব্দে সবাই চমকে উঠল। একটু দূরে অর্জুন গাছের কোটরে জ্বলন্ত চোখে জাঙ্গল আউলের ভয় দেখানো আওয়াজ।

'চল, শুতে যাবার আগে একটা জিনিস দেখে আসি।' আমার প্রস্তাবে সবাই উৎসাহিত, রিসর্টের চৌহদ্দি পেরিয়ে গেট খুলে, অনেকটা এগিয়ে গেলাম কাঁচা রাস্তা ধরে। চাঁদের আলোয় তখন ভাসছে সারা বন। 'ওই দেখ, দূরের বিরাট গাছটা কেমন ধবধবে সাদা চাদরে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পেত্নির মতো, অল্প হাওয়ায় দুলছে। ... যেন বলছে, আঁয় কাঁছে আঁয় ... আঁয়।'

'উরে! কী গাছ গো ওটা? উফ!' টুসু হতবাক।

সবার চোখে বিস্ময়!

'ভূত গাছ, ঘোস্ট ট্রি, স্থানীয় নাম কুল্লু। কি দারুণ তাই না?' আমার উত্তরে হারু এবার বলে উঠল, 'ভূত আমি দেখিনি কভু ... দেখিলাম ভূত গাছ'। হারুর গানে সবাই মজা পেলাম। *(এরপর ৬ পাতায়)*

'কলিং' চলছে

বনের রাজা

(১ পাতার পর)

বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের এক দিকের প্রবেশদ্বার টালায়। তার কাছেই একটি রিসর্ট-এ উঠেছেন বিমলেন্দুরা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ড্রাইভার অজয় শর্মা রিসর্ট থেকে জিপসিতে ওঁদের সবাইকে চাপিয়ে নিয়ে যখন প্রবেশদ্বারের কাছে এসেছিল, তখন সামনে অন্তত পনেরো-ষোলোটা জিপসি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অজয় নির্দিষ্ট জায়গায় কাগজ-পত্র দেখিয়ে তার গাড়ির জন্য নির্দিষ্ট গাইড রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে জিপসিতে ফিরে আসার পর বড়ো জোর মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সকালের এই জঙ্গল সাফারি তিন ঘণ্টার। ছ'টা থেকে ন'টা। পঁয়তাল্লিশটা জিপসিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে পনেরোটাকে 'এ', পনেরোটাকে 'বি' আর পনেরোটাকে 'সি' রুটে চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জিপসিগুলোর সামনে 'এ', 'বি' বা 'সি' লেখা ধাতব পাত ঝুলছে। বিমলেন্দুদের রুট 'সি'। যাত্রা শুরুর সামান্য পরেই ছোটো একটা সেতু পার হওয়ার সময় গাইড রাকেশ জানাল, নিচের ক্ষীণ জলধারার নাম চরণগঙ্গা। নদী চরণগঙ্গা। অথচ দেখে মনে হচ্ছে খাল। রাকেশের কথা অনুযায়ী, এই শীর্ণ জলধারাই বর্ষায় সব পাহাড়ি নদীর মতোই ফুলে ফেঁপে ওঠে, তখন এর অন্য রূপ।

তিনটে রুটে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপসিগুলো পরস্পরের থেকে বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। সকালের সূর্যের মিষ্টি আলোয় ঘুম ভাঙছে জঙ্গলের। কোণা-ঘুপচির অন্ধকার ফিকে হচ্ছে ক্রমশ। চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ছুটছে জিপসি। মাথার উপর দিয়ে বিচিত্র শব্দে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে নানান প্রজাতির কত রকমের পাখি। গাইডের দায়িত্ব পালন করে সেগুলোর নাম মাঝে মাঝে বলছে রাকেশ। কিন্তু সে-সব নামে বিশেষ উৎসাহ নেই কারোরই। সকলের লক্ষ্য এক। অরণ্যের অধিপতি- রাজাধিরাজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। হলুদ শরীরের ওপর কালো ডোরাকাটা অতি সুদর্শন যে প্রাণিটার জগৎজোড়া খ্যাতি, তাকে দেখার আশা নিয়েই তো এত এত মানুষ এই সাফারিতে এসেছে।

পাশের ঝোপঝাড় ঠেলে হঠাৎ বেরিয়ে এল এক দল স্পটেড ডিয়ার। ত্রস্ত-চঞ্চল চাহনি, অনবদ্য-অসাধারণ বর্ণময়। ক্যামেরায় গুছিয়ে স্ন্যাপ নেওয়ার জন্যে চন্দ্রিল অজয়কে গাড়ি থামাতে বলল। অজয় গাড়ি থামাল না, 'মেরি বাত শুনিয়ে সাব, বহুত সারে হিরণ তো আপনি বাদ ভি দেখতে পাবেন, ... লেকিন, যা দেখতে এসেছেন, হামি গাড়ি থামিয়ে দিলে তা মিস হয়ে যেতে পারে'।

এ কথার পর আর কথা চলে না। চন্দ্রিল চুপ করে গেল। বিতস্তার মুখ দেখে মনে হল, সে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ, যদিও সে তার মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় মুহূর্তে মৃগযূথের ছবি তুলে নিয়েছে।

বিমলেন্দু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, রাস্তার পাশে কিছু দূর অন্তর যে ফলকগুলো দাঁড় করানো আছে, তাতে ইংরেজি বর্ণমালার 'বি' অক্ষরটি লেখা রয়েছে। কী আশ্চর্য! এ রকম তো হওয়ার কথা নয়, তাদের তো 'সি' রুট! তিনি রাকেশকে জিজ্ঞেস করলেন 'কী ব্যাপার বলো তো-আমরা কেন 'সি' রুট ছেড়ে 'বি' রুটে ঢুকেছি'?

'হামি সে- কথাই ভাবছি। লেকিন, মতলবটা বুঝতে পারছি না সাব'!

'কার মতলবের কথা বলছ তুমি রাকেশ'?

'হামাদের জিপসির ড্রাইভার অজয়, উসকে'...।

সব কথা-বার্তাই কানে যাচ্ছিল অজয়ের। সে পিছনে তাকাতেই বিমলেন্দু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও কি বলবে অজয় যে, না জেনে বুঝে তুমি এই রুটে চলেছো'?

'নহি সাব, হামি জেনে বুঝেই চলেছি'।

'তার মানে'! বিমলেন্দু অবাক হন, 'তাহলে আমাদের গাইডকে অন্ধকারে রেখেছ কেন'?

'রাকেশ বহুত ডরপোক আদমি হ্যায়, ওকে জানানো রিস্ক হয়ে যেত সাব'।

'কিন্তু কারণটা কী - সেটা আমাকে বলবে তো'? বিমলেন্দু অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

'জরুর বলব সাব, আপনাকে তো বলতে হোবেই'। অজয় শুরু করে, 'হামারে পাস খবর আছে কি, বি-রুটের এক জগহ্ পে এক টাইগ্রেস তার তিন ছানা লিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সব সে পহ্লে জো জিপসি দেখছেন, ওর গাইড মহীন্দরের কাছে ওহ জগহ্ কা পতা আছে। আপনাদের সবার মনখুশ করার জন্য সামান্য রিস্ক তো লিতেই হোবে...। আপলোগ খুশ তো, হামলোগ ভি খুশ... বখশিস মিলবে হামাদের।'

(এরপর ৪ পাতায়)

বাঘ পরিবার

হলদে ডোরাকাটা প্রাণির কথা শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে বাঘ। আমাদের কাছে সব বাঘই একরকম মনে হলেও, বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাদের বিভিন্ন নাম আছে। এক্ষেত্রে গণ, প্রজাতি, উপপ্রজাতি ইত্যাদি বিচার করে বাঘেদের নামকরণ হয়। সাধারণ ভাবে সমস্ত বাঘের নামেরই প্রথম দুটো শব্দ এক - প্যান্থেরা টাইগ্রিস। কিন্তু এই প্যান্থেরা টাইগ্রিসের মোট ৯টি উপপ্রজাতি বা সাব-স্পিসিস রয়েছে। এদের মধ্যে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। যার বৈজ্ঞানিক নাম প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সাইবেরিয়ান বাঘ। এদের বৈজ্ঞানিক নাম প্যান্থেরা টাইগ্রিস আলটাইকা। সবচেয়ে ছোটো প্যান্থেরা টাইগ্রিস সুমাত্রে। এছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ চিনের বাঘ (অ্যামোয়েনসিস), জাভার বাঘ (সনডাইকা), বালির বাঘ (বালিকা), মালয়ের বাঘ (জ্যাকসনি), ইন্দো-চাইনিস বাঘ (করবেটি), কাসপিয়ান বাঘ (ভারগাটা)। এই বাঘ পরিবারের মধ্যে তিনটি উপপ্রজাতি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত - জাভা, কাসপিয়ান ও বালি। সাইবেরিয়ান, অ্যামোয়েনসিস এবং সুমাত্রার বাঘ এখন লুপ্তপ্রায় পর্যায়ভুক্ত। যেকোনো দিন এরাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সবথেকে বেশি

হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে সবথেকে বেশি সংখ্যায় বাঘের বাস বলে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি জানিয়েছে। একবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকের তথ্যানুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২৪৫টি। একই সময়ে তারপরে বাঘের সংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে উত্তরাঞ্চলের জিম করবেট অভয়ারণ্য (১৩৭টি) এবং মধ্যপ্রদেশের কানহা (১১৪টি)।

বিশ্ব ঐতিহ্য স্মারক

ভারতের একমাত্র আসামের মানস অভয়ারণ্য ও টাইগার রিজার্ভকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্মারক বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রথম রাজ্য

একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের তথ্যানুযায়ী দেশের মধ্যে টাইগার রিজার্ভে বাঘের সংখ্যার ভিত্তিতে সবথেকে বেশি বাঘ রয়েছে মধ্যপ্রদেশে। মোট ৭১০টি। তারপরে স্থান কর্নাটকের (৪০১টি)। আমাদের রাজ্যে রয়েছে ৩৪৯টি।

জঙ্গলের ভাগ

প্রতিটি অভয়ারণ্যে রয়েছে দু'টি ভাগ। একটি বাফার জোন এবং অন্যটি কোর এরিয়া। বাফার জোনে নির্দিষ্ট সময় ও অন্যান্য নিয়মাবলী মেনে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি থাকলেও কোর এরিয়াতে বন দপ্তরের আধিকারিক ও বনকর্মী ছাড়া কখনোই প্রবেশ করা যায় না।

বাঘ যখন শিকারী

গবেষকরা বলছেন একটি বাঘ ৮দিনে একটি শিকার করে। কিন্তু বাচ্চা থাকলে বাঘিনী প্রতি ৫দিনে একটি শিকার করে থাকে। সাধারণভাবে বাঘ দিনের বেলায় বিশ্রাম নেয় এবং সন্ধ্যা নামলে শিকারে বেরোয়।

বাঘ যখন শিকার

ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র তথ্যানুযায়ী ২০১৩ সালে ৪২টি বাঘ চোরাশিকারীদের হাতে মারা গিয়েছে। সবথেকে বেশি ১৯৯৫ সালে, ১২১টি। আমাদের দেশে বাঘের চামড়া বা হাড়ের কোনো চাহিদা না থাকলেও ওষুধ তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশে হাড়ের ও ঘর সাজানোর জন্য বাঘের চামড়ার চাহিদা রয়েছে।

বনের রাজা

(৩ পাতার পর)

'হামাদের মানে'?

'এই যে সি-রুটের পাঁচ জিপসি বি-রুটে ঢুকেছে, এগুলোর গাইড আর ড্রাইভারদের কথাই বলছি হামি'। অজয় খুব উচ্ছল ভঙ্গিতে বলে চলে,' বি-রুটের আসলি -মতলব , জেনুইন জিপসিগুলো কিন্তু পতা জানে না ও বাঘিনীটার'।

চন্দ্রিল ও বিতস্তা মন দিয়ে শুনছিল, অজয় থামতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওরা, 'তার মানে- আজ অবশ্যই ব্যাঘ্র-দর্শন হচ্ছে আমাদের।'

বেশ কিছুটা পথ পার হওয়ার পর সামনে তিন-চার ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। বেশি ঘন নয় আর অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতও নয়। সেই ঘাস জঙ্গল পার হওয়া মাত্রই সামনের দুটো জিপসি হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ফাঁকা জায়গায়। অজয় কোনোক্রমে পাশ কাটিয়ে সংঘর্ষ এড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শুকিয়ে আমসি। রেঞ্জার ও তার সহকারী পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। একেবারে 'কট রেড হ্যান্ডেড' যাকে বলে। পাঁচজন গাইডের প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা করে জরিমানা এবং আগামী পনেরো দিনের জন্য কাজ থেকে সাসপেন্ড করলেন রেঞ্জার সাহেব। জিপসিগুলোর নম্বর নোট করে নিয়ে ড্রাইভারদের কাগজে লিখে দিলেন- আগামী পনেরো দিন গাড়িগুলো 'জাঙ্গল-সাফারি'তে আসতে পারবে না।

জঙ্গলে এক ধরনের নিস্তব্ধতা সব সময়েই পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তা যেন মুহূর্তে শতগুণ হয়ে নেমে এল। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। তারপর, বিমলেন্দুই মুখ খুললেন, 'ঠিক এমনই এক আশঙ্কা আমি করেছিলাম।'

রাকেশকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'দায়ি তো তুমি নিজেই রাকেশ। তুমি গাইড, শুরুতেই রুট-বদল মেনে না নিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিতে পারতে। কিন্তু, তা যখন করোনি, শাস্তিভোগ তো তোমাকে করতেই হবে।'

'নসিব সাব-মেরা নসিব।'

'নসিবের দোহাই দিও না একদম,' বিমলেন্দু ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন না, 'অজয় বলেছে, তুমি ডরপোক আর সেই কারণেই তোমাকে আগেভাগে কিছুই জানায়নি। আমার মনে হয়, তুমি আসলে একজন সৎ মানুষ, নিয়ম-কানুন মেনে চলতে ভালবাসো ...'

'সহি বাত সাব- বিলকুল সহি।'

'কিন্তু এখন এ কথা বলে কী লাভ! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। নিয়ম যারা ভেঙেছে, তাদের থেকে নিজেকে তুমি তো আলাদা করতে পারোনি, পেরেছ কি''?

রাকেশ উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বিলাপ করতে থাকে, 'মুঝে ফাঁসা দিয়া সব লোগ, অব কেয়া হোগা মেরা বেটা কা?'

'কী হয়েছে তোমার ছেলের?'

'হপ্তাভর উসকো বহুত বুখার। ডক্টরনে জো দাওয়াই দিয়া, ওই ভি খতম হো গয়ি...। কঁহাসে মিলেগা রুপাইয়া?' রাকেশ একেবারে ভেঙে পড়ে।

নির্বাক অজয়কে উদ্দেশ্য করে বিমলেন্দু প্রশ্ন ছোড়েন, 'এখন তুমি যাচ্ছ কোথায় অজয়?'

'সি-রুটপে সাব।'

'কেন! সি-রুটে কেন? বাঘিনী দেখাবে না আমাদের!' ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলতে থাকে বিমলেন্দু, আহা রে- তিন তিনটে ছানা নিয়ে সে বেচারি কখন থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে!'

পথে কিছু হরিণ আর শম্বর ছাড়া অন্য কোনো জন্তু চোখে পড়ল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচটা জিপসি পৌঁছে গেল সেন্ট্রাল পয়েন্টে। ঘড়িতে তখন সাতটা দশ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনটে রুটের সব গাড়ি একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ঠিক সাড়ে সাতটায় জিপসিগুলো আবার সাফারিতে বেরবে এবং তখন থাকবে না রুট-রেসট্রিকশন।

কিন্তু সেন্ট্রাল পয়েন্টে পৌঁছেই যে চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেল, তা শুনে চন্দ্রিলের আফশোসের সীমা নেই। বিতস্তার ক্ষুব্ধ মন্তব্য 'চালাকির ফল এমনই হয়'।

'সি-রুটের জিপসিগুলো নাকি ডাইভারশনের সামান্য পরেই একেবারে কাছ থেকে বনের রাজাকে দেখেছে। সেই রাজা হল বান্ধবগড় অভয়ারণ্যের বিখ্যাত বাঘ, 'বিটু'। বার্কিং ডিয়ারের 'অ্যালার্ম কল' শুনেই জিপসিগুলো ইঞ্জিন বন্ধ করে পরপর দাঁড়িয়ে যায় আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে বিটু নাকি দর্শকদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নানা রকম পোজ দিয়েছে। তারপর, ভারিক্কি চালে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেছে উল্টোদিকের জঙ্গলে। জায়গাটা এই সেন্ট্রাল পয়েন্ট থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে। ওয়াকি টকি-তে খবর পেয়েই এক রেঞ্জার অফিসার বিটুকে 'স্পট' করে ফেলে, পরপর হাতির পিঠে টুরিস্ট চাপিয়ে পাঠাচ্ছেন তাকে দেখার জন্য। তাই, বড়সড় একটা লাইন পড়েছে সেন্ট্রাল পয়েন্টের টিকিট কাউন্টারের সামনে।

চন্দ্রিল আর বিতস্তা হইহই করে জিপসি থেকে নেমে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু, ভাগ্য এবারও বিরূপ। কাউন্টারের একেবারে গোড়ায় পৌঁছে ওরা শুনল, বিটু নাকি উঠে হাঁটা দিয়ে চলে গেছে গভীর জঙ্গলে। অতএব, আধঘণ্টার 'জয় রাইড'-এ হাতির পিঠে চেপে বনের মধ্যে ঘুরতে যে সব টুরিস্ট ইচ্ছুক, তারাই কেবল টিকিট কাটতে পারে।

চন্দ্রিল-বিতস্তা ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসল। 'জয় রাইড'-এ কোনো উৎসাহ নেই তাদের। চন্দ্রিল রাকেশকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোন পথে যাবে?'

'আপলোগ চাহেঁ তো সি-রুট পে ফির...।'

'না-এক কাজ করো রাকেশ', চন্দ্রিল আস্থার সঙ্গে বলল, 'শায়িত বিষ্ণুমূর্তি'র কথা গাইড বুকে পড়েছি, সেখানেই চলো...।'

রাকেশ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ-আপ নে সহি সোচা, ওহ জগহ্ কা আসপাস বহুত জঙ্গল আছে, অকসর টাইগার ভি নজদিক চলে আসে।'

অজয় বেশ দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ চলে গেছে বান্ধবগড় ফোর্টের দিকে আর অন্য ভাগ গেছে 'শায়িত বিষ্ণুমূর্তি'র দিকে। সেই পথে চড়াই ভেঙে জিপসি গন্তব্যে পৌঁছে যেখানে থামল, সে-জায়গাটা একেবারেই অন্যরকম। অসম্ভব নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝর্নার কুলকুলু ধ্বনি...আর মাঝে মাঝে চেনা-অচেনা পাখির কূজন...।

জিপসি থেকে নেমেই চন্দ্রিল বিতস্তাকে নিয়ে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে ছুটল। পেছনে পেছনে বিমলেন্দু-জয়তির সঙ্গে রাকেশ এগোল ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। এই একটা মাত্র জায়গাতেই টুরিস্টদের জিপসি থেকে নিচে নামার অনুমতি আছে।

সামান্য কয়েক ধাপ উঠতেই ওদের চোখে পড়ল, দশম শতকে তৈরি ৩০ ফুট দীর্ঘ বিষ্ণুর শায়িত মূর্তি- 'শেষ সায়া' অর্থাৎ, শেষ শয্যা। বিষ্ণুর পায়ের তলায় সৃষ্টি হয়ে নেমে আসছে চরণগঙ্গা নদী। বিষ্ণুর মাথার ঠিক পেছনে শেষনাগের ফণা। সেটা ছাড়িয়ে সামান্য দূরে শিবলিঙ্গ। সকাল সাড়ে আটটাতেও জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার। আসলে, ঘন জঙ্গল ভেদ করে সূর্যের আলো অল্পই ভেতরে ঢুকছে।

কয়েকজন সাহেব-মেমসাহেবকে অনুসরণ করে চন্দ্রিল আর বিতস্তা বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠে গেছে। রাকেশ শর্টকাট পথে দ্রুত ওদেরকে ধরে ফেলল।

সাহেব-মেমসাহেবরা ওই জায়গা থেকে টেলিলেন্সে যখন বান্ধবগড় ফোর্টের একাংশের ছবি তোলার চেষ্টা করছে, রাকেশের সন্ধানী চোখ তখন ঝোপ-ঝাড়ের দিকে, কান সতর্ক 'অ্যালার্ম কল' শোনার জন্য। কিন্তু সেদিন সৌভাগ্যের সঙ্গে রাকেশের যেন পুরোপুরি আড়ি। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে নিচে নেমে এল তিনজন।

একটু আগে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে দেখতে জয়তি বিমলেন্দুকে বলেছিলেন, 'রাকেশের জন্যে আমরা তো কিছু করতে পারি ... না কি?'

'কী করতে চাও বলো, আমার কোনো আপত্তি নেই।' বিমলেন্দুর সহৃদয় উত্তর।

'আর্থিক সাহায্য করতে পারি আমাদের সাধ্যমতো', জয়তি আন্তরিক ভাবে বলে উঠেছিলেন, 'এই ট্যুরে তো কত দিকেই কত খরচ হয়ে যাচ্ছে, বলো ...।'

জিপসি ফিরে চলেছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে টালার সেই প্রবেশদ্বারে, যেখান দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা হয়েছিল।

বিমলেন্দু হঠাৎ পকেট থেকে পার্স বের করে দু'টো পাঁচশো টাকার নোট রাকেশের হাতে গুজে দিতে চেষ্টা করেন। রাকেশ হকচকিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'কেয়া করতে হ্যায় সাব! ম্যায়নে গলতি কিয়া ...'

'আরে, সে-কথা নয়!' বিমলেন্দু জোর করে নোট দুটো রাকেশের পকেটে চালান করে দিয়ে বলেন, 'তোমার জন্য নয় রাকেশ, তোমার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য দিলাম, তুমি নেবে না?'

রাকেশ মাথা নিচু করে রইল, তার চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। হঠাৎ সে সচকিত হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করে, তারপর ... লাফিয়ে উঠে অজয়কে বলে, 'রুখ জা ইয়ার, রুখ জা...।'

দ্রুত ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যালার্ম কল'... ডেকে ওঠে বার্কিং ডিয়ার, কয়েকটা বাঁদর গাছ থেকে গাছে লাফালাফি করে সরে পড়ে এদিক ওদিক। গাড়ি থেকে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরত্বে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসে জঙ্গলের রাজা। অপূর্ব-অনবদ্য! তার সোনালি শরীরের ওপর সকালের সোনা রোদ্দুর। কালো ডোরাগুলো আরো স্পষ্ট। কী তার হাঁটা-চলার ভঙ্গিমা! রাজকীয় দৃষ্টি মেলে সে যেন বলতে চায় - আশ্চর্য! আমাকে না দেখেই তোমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলে!

বিজ্ঞানের খবর

ইলেকট্রনিক নোজ

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

চেখে চায়ের গুণ বিচারের দিন শেষ। এখন যন্ত্র বলে দেবে চায়ের সার্বিক গুণমান। টি-টেস্টারের ব্যক্তিগত পছন্দের চা নিয়ে আর নাজেহাল হতে হবে না। শুধু তাই নয়, যন্ত্রই এবার স্বাদের মান বলে দেওয়ার ফলে চায়ের দাম ঠিক করতেও চা কোম্পানিগুলিকে বেগ পেতে হবে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক) একযোগে তৈরি করলো 'ইলেকট্রনিক নোজ'। নামেই বোঝা যাচ্ছে নাকের ঘ্রাণ শক্তির বিরল গুণকে এবার নিয়ে আসা গেছে যন্ত্রের আয়ত্তে। ইলেকট্রনিক নোজ বা বৈদ্যুতিন নাক যন্ত্রের কর্মক্ষমতা নিয়ে দারুণ উৎসাহী চা কোম্পানিগুলি। দেশের কয়েকটি চা কোম্পানি ইতিমধ্যে এই যন্ত্র নাক ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্ট্রুমেন্টেশান অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিজ্ঞানীদের এই মৌলিক গবেষণাকে বাস্তবায়িত করেছে সল্টলেকের কেন্দ্রিয় কম্পিউটার গবেষণা সংস্থা সি-ড্যাক। বিক্রির দায়িত্বও বর্তেছে সি-ড্যাকের ওপর। বাজারে যন্ত্র নাক'কে নিয়ে আসতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্ট্রুমেন্টেশান অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ড. রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন সি-ড্যাকের প্রবীন বিজ্ঞানী ড. নবারুণ ভট্টাচার্য। গন্ধবিচারে যন্ত্রের ব্যবহারের ভাবনাটি বিজ্ঞানী নবারুণ ভট্টাচার্যের মাথায় প্রথম আসে। সেদিন থেকে যন্ত্র নাকের রূপকার একযোগে দুই বিজ্ঞানী। যন্ত্র নাকটির বাজারি নাম 'ইলেকট্রনিক নোজ অ্যান্ড ভিশন সিস্টেম।'

বাজারে আসতেই জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছে গেছে যন্ত্র নাক। চায়ের গুণগতমান ঠিক করতে পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক চা কোম্পানি তা বসিয়েও নিয়েছেন চা কারখানায়। ২৮টি যন্ত্র বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কার্শিয়াঙের চা কোম্পানিতে বসেছে একটি যন্ত্র নাক। আসামের জোড়হাটে বসানো হয়েছে আরো কয়েকটি। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই যন্ত্রের দাম পড়ছে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা। কাজ করার হিসাবে এই যন্ত্রের দামটাও খুব একটা বেশি নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ধরণের যন্ত্রের দাম কয়েকশো গুণ।

বাজারে আসতেই জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছে গেছে যন্ত্র নাক। চায়ের গুণগতমান ঠিক করতে পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক চা কোম্পানি তা বসিয়েও নিয়েছেন চা কারখানায়। ২৮টি যন্ত্র বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কার্শিয়াঙের চা কোম্পানিতে বসেছে একটি যন্ত্র নাক।

যন্ত্র নাকের বিক্রি আর চাহিদা রমরমিয়ে বাড়লেও এখনো গন্ধ বিচারের যন্ত্রটির মৌলিক স্বীকৃতি হাতে পাননি বিজ্ঞানীরা। পেটেন্টের জন্য যন্ত্র নাকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাঠানো হয়েছে পেটেন্ট অফিসে। কবে পেটেন্ট মিলবে তার জন্য অবশ্য বিজ্ঞানীদের পরবর্তী গবেষণা থেমে নেই। বিজ্ঞানীরা চালিয়ে গেছেন আরো ছোটো, দামে কম, কার্যকরী ইলেকট্রনিক নোজ তৈরির গবেষণা। টানা গবেষণাতে সাফল্যও এসেছে দ্রুত। এ বছরের মার্চ মাসে তৈরি করা গেছে 'পোর্টেবল ইলেকট্রনিক নোজ'। যন্ত্র নাকের এই সাফল্যের পর বিজ্ঞানীদের পরবর্তী গবেষণা ক্ষেত্র যন্ত্র জিভ বা ইলেকট্রনিক টাং। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে চলছে সেই গবেষণা। যন্ত্র নাকের অন্যতম উদ্ভাবক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পোর্টেবল ইলেকট্রনিক নোজ যন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সুবিধাজনক দিক হলো একে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। দেখতে সামান্য একটি সুটকেসের মতো। আকারে ছোটো করার সঙ্গে পুঁচকে যন্ত্র-নাকের বিক্রির দামকেও এক ধাক্কায় অনেকটা কমানো গেছে। পুঁচকে যন্ত্র নাকের বিক্রির দাম দাঁড়াচ্ছে ১ লক্ষ টাকা। একসাথে কয়েকটি কিনলে মোট দাম অনেকটাই কমে যায়।

আশানুরূপ কাজের জন্যই 'ইলেকট্রটিক নোজ অ্যান্ড ভিশন সিস্টেম' শুরুতেই ভলো বাজার পেয়েছে। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া শুরু করেছে যন্ত্র নাক। কেনিয়া যন্ত্র নাক বানাচ্ছে। অপর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ড. নবারুণ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, প্রথাগত ভঙ্গিতে চায়ের গন্ধ বিচার করে দেওয়া টি টেস্টারের দেওয়ার বিচারের সঙ্গে ৮০-৮৫ শতাংশই হুবহু মিলছে এই যন্ত্র নাকের বিচার।

যন্ত্রের গন্ধ বিচার এখন অবশ্য শুধুই চায়ে থেমে নেই। ইন্ডিয়ান স্পাইস বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক মশলার গুণগত মান খুঁজতেও নতুন যন্ত্র তৈরিতে হাত দিয়েছেন এই বিজ্ঞানীরা। চুঁচুড়ার রাইস রিসার্চ স্টেশনের চাহিদা মোতাবেক বাসমতী চালের গুণগত মান নির্ধারণ করতে তৈরি করা হয়েছে আর একটি যন্ত্র। কল্যাণীর বিধানচন্দ্র রায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চলছে নয়া যন্ত্রের কর্মকুশলতা। পরীক্ষাটি সফল হলে এক মিনিটেরও কম সময়ে বাসমতী চালের গুণমান জানা যাবে। ফুটিয়ে ভাত করে চালের গুণগত মান জানার প্রয়োজন পড়বে না।

গন্ধবিচার যন্ত্রের শক্তি বাড়াতে গবেষকদের পরবর্তী লক্ষ্য রাসায়নিক সেন্সরের বদলে বায়োলজিক্যাল সেন্সারের ব্যবহার। বায়োলজিক্যাল সেন্সরকে কাজে লাগাতে পারলে 'টি টেস্টার'দের মতো সার্টিফিকেট দিতে পারবে যন্ত্র নাক। সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে চায়ের সুগন্ধ (অ্যারোমা), স্বাদ (টেস্ট), আকৃতি (অ্যাপিয়ারেন্স) সবটাই বলে দেওয়া যাবে। বায়োলজিক্যাল সেন্সরে তৈরি যন্ত্র নাক মোড়কজাত খাদ্যের পচনমাত্র বলে দেওয়ার সঙ্গে সেই খাবারের বাইরে রাখার মেয়াদও (শেলফ্ টাইম) বলে দিতে পারবে। মোড়কজাত খাদ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানির কাছেও যন্ত্র নাকের চাহিদা রয়েছে।

ছন্দ মেলাও

গত সংখ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী সামনে রেখে দিয়েছিলাম একটি ছড়া। আমাদের দপ্তরে সেই ছড়াটির ফাঁক ভরিয়ে এসেছে অসংখ্য উত্তর। প্রকৃত পক্ষে উপযুক্ত ও সঠিক উত্তর বাছতে সম্পাদকীয় দপ্তরের অবস্থা কাহিল। স্থানাভাবে সকলের উত্তর এখানে প্রকাশ করা গেল না। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম : **সানি আচার্য**, বেলঘরিয়া; **সুতপা পাল**, শিবপুর, হাওড়া; **দীপাঞ্জন ঘোষ**, টবিন রোড; **ঋক মৈত্র**, বেহালা; **কাজল সাহা**, শিয়ালদহ।

লটারিতে যে ছড়াটি নির্বাচিত হয়েছে সেটির ছন্দ মিলিয়েছে কোন্নগরের **শুভার্থি চক্রবর্তী**।

কবিগুরুর জন্মদিন আজ
২৫শে বৈশাখ
ছড়া-গল্পে-কবিতায়
মুখর হয়ে থাক।

পরের 'ছন্দ মেলাও' প্রকাশিত হবে ১ জুন।

ভুল, দুঃখিত

'কিচির মিচির'-এর গত ১ মে সংখ্যার প্রথম পাতায় 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশু সত্যাজিৎ'-নামাঙ্কিত একটি ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের প্রিয় পাঠকেরা জানিয়েছেন, ছবিটি রাণি চন্দের পুত্র অভিজিৎ চন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশু সত্যজিৎ-এর কোনো ছবি নেই এবং প্রিয় পাঠকেরা সঠিক ভাবেই আমাদের ভুল নজরে এনেছেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। - *সম্পাদকীয় বিভাগ*

বড়োদের face বুক

আলোচ্য বিষয় ছিল 'শিশু কিশোরদের মধ্যে কী পড়াশোনার বইয়ের বাইরে বই পড়ার প্রবণতা কমছে? বড়োরা এরজন্য কতটা দায়ি?'

সম্পায়ন চক্রবর্তী : আজকের দিনে যেখানে বহু শিশু কিশোরেরা পড়াশোনার বই ছাড়া অন্য ধরনের লেখা, বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, এরজন্য অনেকটাই দায়ি তাদের অভিভাবকেরা। অধিকাংশ বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে ইঁদুরদৌড়ে সামিল করছেন, হতেই হবে প্রথম। সত্যিই আজ শিশু-কিশোরদের মননে অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে গতানুগতিক পড়াশোনা ও ইঁদুরদৌড়ে প্রথম হওয়ার চিন্তা। কিন্তু আমার ধারণা এর বাইরেও একটা অংশ রয়েছেন যাঁরা শিশুকে ট্যাব, মোবাইল ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন না, দেন ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাকাবাবু কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সেই অংশের অভিভাবকেরা শিশুমনকে নির্মল আনন্দে ভরিয়ে দিতে চান। নিজেদের সুস্থ সংস্কৃতি বোধকে শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। এখন অনেকের মুখেই শোনা যায় 'দেবের চাঁদের পাহাড়', 'প্রসেনজিৎ-এর মিশর রহস্য'। অল্প হলেও কিছু মানুষ লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। বাবা-মায়েরই দায়িত্ব ছোটোদের হাতে শঙ্কু, টেনিদার বই; তাহলেই মহানদী আকার নেবে বই না পড়ার লুপ্ত চোরাস্রোত।

পরবর্তী বিষয়ের জন্য 'কিচির মিচির'-এর ফেসবুক পেজ-এ নজর রাখুন।

পরবর্তী সংখ্যার আকর্ষণ

মাঝে আর মাত্র ক'টা দিন। শুরু হতে চলেছে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপ। গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ নজর রাখবেন টেলিভিশনের পর্দায়, খবরের কাগজের পাতায়। মাঠের এই লড়াইয়ের উত্তাপের আঁচ 'কিচির মিচির'-এর পাতায়। লিখবেন কলকাতার ফুটবল মাঠের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকরা।

থাকছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে। এছাড়াও নিয়মিত বিভাগ - হবি, অবাক খেলা, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, দাবা চর্চা, পেটসেটেরা, গুপ্তধন, কচিপাতা, ছন্দে আনন্দে, মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা ...

বাঘবনের কাহিনি

(২ পাতার পর)

'চল, এবার ফিরি। কাল ভোর ৬টায় আবার জঙ্গল সাফারি, ৫টায় উঠে রেডি হতেই হবে।'

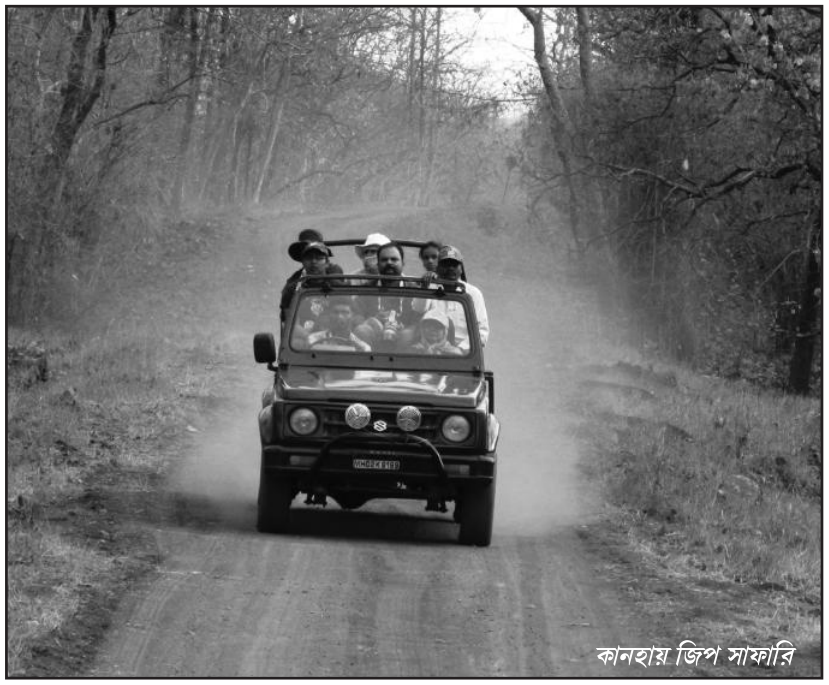

কানহায় জিপ সাফারি

বনওয়ারিলালের মারুতি জিপসি ভ্যানে চেপে অরণ্যে ঢুকেছি সেই ভোর ছ'টা ...। যে ঘটনা দিয়ে এই গল্প শুরু করেছিলাম। গাইড রোহন সিং ছটফটে লোক। একেবারে সকালে আর নয়তো পড়ন্ত বিকালে টাইগার সাইটিং-এর মোক্ষম সুযোগ, জানিয়ে দিল। কাঁচা অরণ্য পথ ধরে গাড়ি চলছে আস্তে আস্তে। গাইডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বত্র। সকালেই কয়েক ঝাঁক সম্বর আর চিতল হরিণের দারুণ দৃশ্য দেখা গেছে। ময়ূর তো চড়াই পাখির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে, পোজ দিচ্ছে মনের আনন্দে। সকালের অরণ্য কী সুন্দর! একটা শিরশিরানি হাওয়ার সঙ্গে তাজা বনজ গন্ধ। হঠাৎ! দেখা গেল রাস্তার একপাশ ধরে বাঘের পায়ে ছাপ। একদম টাটকা।

'ইয়ে মেল টাইগারকে পাঞ্জা কা নিশান, দেখিয়ে কিতনা বড়া পাগমার্ক (পায়ের ছাপ)।' গাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে রোহন জানান দেয়। 'আগে বঢ়া, জলদি ...' ড্রাইভারকে হুকুম দেয় এবার। 'মুন্না আগে চল রহা হ্যায়, বিচ রাস্তেমে ...' বুঝতেই পারলাম বাঘ মহারাজের একটা নাম দেওয়া হয়েছে 'মুন্না'। গাড়ি এগিয়ে চলল পাগমার্ক ফলো করে। কিছুটা যাওয়ার পর পায়ের ছাপ উধাও। মানে আশেপাশের জঙ্গলে নিশ্চয় ঢুকে গেছেন তিনি আপন খেয়ালে। কানহার 'কিসলি' জোনে তখন গোটা অরণ্য কেমন যেন থম্‌কে আছে। আসলে বাঘ ভ্রমণে বেরোলে জঙ্গল এরকমই হয়ে যায়। সমস্ত জংলি প্রাণি চুপচাপ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। একটা ক্রেস্টেড সার্পেন্টাইল ঈগল একদম গাছের মগডালে বসে কী যেন দেখছে আর মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। কুঁইক-ইক। 'কিসলি', 'মুক্কি' আর 'সেরাই' তিনটি জোনে ভাগ করা রয়েছে এই বিশাল অরণ্য। এই কিসলি জোনেই সোয়াম্প ডিয়ার বা বারাশিঙা হরিণের বিশেষ সংরক্ষণ। কী অপূর্ব রূপ আর শিঙের কারুকার্য দেখলে মন ভরে যায়। গাড়ি ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যর আর এক প্রান্তে এসে পড়ে। হঠাৎ, একদল বুনো শুয়োর কেমন পাগলের মতো দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে গেল। কয়েকটা হনুমান একদম গাছের উপর থেকে খ্যাঁচ .... খ্যাঁচ করে ডাকছে থেকে থেকে। গাইড এক লাফে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল উত্তেজনায়। **মুখে একটা বাক্য 'কলিং চল রহা হ্যায়'। আমার নাকেও কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ লাগল। একটা হরিণ তীব্র গতিতে আওয়াজ দিল কুঁক ... কুঁক ... কুউ...ক। সারা অরণ্য জুড়ে চলছে 'কলিং' অর্থাৎ হনুমান গাছের উপর থেকে বাঘ দেখতে পেয়েই হরিণকে জানাচ্ছে সাবধান! হরিণও আওয়াজ দিয়ে সজাগ করছে তার সাঙ্গপাঙ্গদের। আচমকা সব নিস্তব্ধ।** 'গাড়ি সাইড করকে লগা দে' রোহন চাপা গলায় বলে ড্রাইভারকে। সবাই তখন বাক্যিহারা। চুপচাপ অরণ্যে শুধুই পাতার খসখসে আওয়াজে তীব্র উত্তেজনা। আচমকা, শিহরণ জাগিয়ে আওয়াজ হুমম্... ম্..... উয়াঁহু... হালুম... ম। চাপা অথচ তীব্র টাইগার গ্রাওলিং। উফ.... ফ! মহারাজের কণ্ঠস্বর। কিন্তু কোথায় সে? আরো কয়েকটি গাড়ি এসে গেছে সবার দৃষ্টি সজাগ আর উত্তেজনায় কাঠ। হঠাৎ, সবুজ অরণ্য চিরে হলুদ-কালোর ঝলকানি। বিরাট মাথা নিয়ে প্রকাণ্ড 'মুন্না' রাজকীয় চালে রাস্তা পেরোচ্ছে ... বাহ! অপূর্ব!

'দেখিয়ে সাব দেখিয়ে, মাথার উপর কালো হলুদে কী রকম সৃষ্টি, যেন লেখা আছে CAT।' বাঘতো Cat প্রজাতির প্রাণি তাই না? যার বৈজ্ঞানিক নাম 'প্যান্থারিয়া টাইগ্রিস টাইগ্রিস' বা 'ফেলিস টাইগার'। ভাবলেও খারাপ লাগে এই অসাধারণ প্রাণিটার নখ, চুল, দাঁত, চামড়াসহ মাংস বিক্রির লোভে একদল নোংরা লোক শুধু টাকার বিনিময়ে এই বিরল প্রাণিকে সুযোগ পেলেই খুন করে পাচার করছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাই সবাই মিলে এই ভয়ংকর সুন্দরকে রক্ষা না করলে, যত্ন না করলে আজকের বুম্বারা হয়ত এই শেষ বাঘ দেখছে গভীর জঙ্গলে। ভবিষ্যৎ-এর বুম্বারা হয়তো শুধুই বাঘ দেখবে, চিড়িয়াখানায় ঘেরা কংক্রিট জঙ্গলে।

ছবি: **শৈবাল দাশ**

হেলথ্ ডায়েরি

ভারত আজ পোলিও মুক্ত

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। ভারত পোলিও-মুক্ত দেশের বিরল মর্যাদা পেল। ২৭ মার্চ নয়াদিল্লিতে হু'র (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) তরফে কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদের হাতে পোলিও মুক্তির সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হলো। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশ একযোগে পোলিও মুক্তির শংসাপত্র পেল। বাকি থাকা বাংলাদেশ, ভূটান, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, তিমোর-লাস্তে পোলিও মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বের চতুর্থ পোলিও মুক্ত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি পেলো।

গুটিবসন্ত নির্মূলকরণের শংসাপত্র ভারত পেয়েছিলো ১৯৭৯ সালে। তার ঠিক ৩৫ বছর বাদে পোলিও মুক্তির এই স্বীকৃতির জেরে ভারত উন্নত দেশ হওয়ার পথে কয়েক কদম এগিয়ে গেলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পোলিও মুক্ত হয়ে যাওয়াটা হু'র কাছে একটা বড়ো সফলতা। কারণ বিশ্বে ১৯৪টি দেশের মধ্যে ৩টি দেশ এখনো পোলিও মুক্ত হতে পারেনি। পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর নাইজেরিয়া ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বাচ্চাদের আজন্মের প্রতিবন্ধকতার রোগ পোলিও নির্মূল। ১৯৯৪ সালে আমেরিকা, ২০০০ সালে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ, ২০০২ সালে ইউরোপ পোলিও মুক্তির শংসাপত্র পেয়ে গেছে।

ভারত সরকার ১৯৮৫ সালে পোলিও টিকাকরণ এক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে। হু'র দেখানো পথে ১৯৯৫ সালে শুরু হয় পোলিও নির্মূলের জন্য প্রচার অভিযান। পোলিও রোগ নির্মূলকরণ অভিযান ১৯৯৭ সালে জোরালোভাবে কাজ শুরু করে। ন্যাশনাল পোলিও সার্ভিলেন্স প্রজেক্ট'কে (এনপিএসপি) সামনে রেখে পোলিও রোগী শণাক্তকরণের সঙ্গে চলতে থাকে টিকাকরণ প্রকল্প। পোলিও জলবাহিত রোগ হওয়ায় এলাকার সব শিশুকে টিকা না দিলে তা আবার ফিরতে পারে। এই আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় শুরু হয় 'পালস্ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি'।

একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশের সব শিশুকে একযোগে পোলিও টিকা খাওয়ানোর সার্বিক প্রকল্প দারুণ সাড়া পেয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ বছরের নিচে সব শিশুকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই কাজ করতে কমপক্ষে দু'লক্ষ স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী টানা ১৯ বছর ধরে পোলিও অভিযানে শামিল হয়েছেন। হাত মিলিয়ে ছিলেন অনেক গণসংগঠন আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীবৃন্দ। পোলিও টিকা যেহেতু দু'ফোঁটা মুখে খেলেই চলে তাই তা প্রয়োগেও কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। তবে যখন পোলিও কর্মসূচি শুরু হয়েছিল তখনও প্রতি বছর ভারতে ৫০ হাজারেরও বেশি শিশু এই রোগে আক্রান্ত হতো। সেই অবস্থায় দেশের সমস্ত শিশু ও তাদের পরিবারের কাছে সময়মতো টিকা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পোলিও রোগের ভয়াবহতা কমিয়ে শিশুদের সুস্থ জীবনে নিয়ে আসতে রকমারি কর্মসূচি চালিয়েছিল ভারত

সরকার। সরকারি হিসাব বলছে, দেশের প্রায় ১৭ কোটি শিশুকে পালস্ পোলিও টিকাকরণের আওতায় আনতে ২৫ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যেতে হয়েছে।

২০১৩ সালের শেষে একজন পোলিও রোগী না পাওয়ায় ভারতকে পোলিও মুক্ত দেশ বলে ঘোষণা করা হবে সেকথা ১৮ মার্চ প্রথম জানিয়েছিলো হু। ২৭ মার্চ সেই ঘোষণাতেই সরকারি সিলমোহর, কিন্তু ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে এক শিশুর পোলিও রোগ ধরা পড়ে। তবে একদিনে আসেনি এই সাফল্য। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে পালস্ পোলিও কর্মসূচি গ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকেই পোলিও রোগ কমতে দেখা গেছে। ওই বছর গোটা দেশে রোগীর সংখ্যা পাওয়া গেছিলো ৭৪১ জন। পরের বছর আরো কমে দাঁড়ায় ৪২।

২০১০ সালের পর থেকে পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি সারা দেশে ১টি মাত্র রোগীর দেখা মিললো। তাও এই পশ্চিমবঙ্গে। হাওড়ার পাঁচলার সাহাপাড়ায় রুকসা নামে একটি ছোট মেয়ের পোলিও আক্রান্তের ঘটনায় পোলিও মুক্তির ঘোষণা পিছিয়ে যায়। তবে এখন সবটাই অতীত। হু অবশ্য জানাচ্ছে এখনই পালস্ পোলিও কর্মসূচিকে বন্ধ করা যাবে না। তবে পোলিও ড্রপ ভ্যাকসিনের পাশাপাশি ইন-অ্যাকটিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

অভিযানের আনন্দ ...

আনত সাগরমাথা

মৌসম মজুমদার

সৌরজগতের প্রাণময় গ্রহের উচ্চতম স্থান হল বিশ্বের উচ্চতম পর্বতমালা হিমালয়। আর সেই হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। ভৌগলিক সীমানা অনুযায়ী নেপাল-চিন সীমান্তে অবস্থিত এই পর্বতশৃঙ্গ কিন্তু ভারতবর্ষে নয়। তাই নেপালের সর্বোচ্চ তথা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট হলেও ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী। এভারেস্টের উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার বা ২৯,০২৯ ফুট। অক্ষাংশগত ভাবে ২৭°৫৯´১৭´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৮°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাগত ভাবে ৮৬°৫৫´৩১´´ পূর্ব থেকে ৮৭°৩২´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই শৃঙ্গটি।

মাউন্ট এভারেস্টের কাছাকাছি আরো তিনটি শৃঙ্গ হল লোৎসে (৮,৫১৬ মিটার), নাপাৎসে (৭,৮৫৫ মিটার) এবং চাঙগৎসে (৭,৫৮০ মিটার)। মজার ব্যাপার হলো এভারেস্ট নামটি বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত হলেও নেপালে এটি 'সাগরমাথা', তিব্বতে 'কোমোলাংমা' বা 'চোমোলাংমা' বা 'জো মোগলাংমা' নামে পরিচিত। এভারেস্ট নামকরণের আগে নেপাল-তিব্বতে ধর্মীয় কারণে বিদেশিদের প্রবেশাধিকার না থাকায়, স্থানীয় নাম দুটি বিশ্বের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। এভারেস্ট আবিষ্কারের আগে বিশ্বে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কেই মানা হত। ১৮০২ সাল নাগাদ বৃটিশ জরিপদল ঐতিহাসিক 'গ্রেট ট্রাঙ্গুলেশন সার্ভে'র মাধ্যমে ভারতবর্ষের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় শুরু করেছিল। এই সময় ওই জরিপদল 'থিওডো লাইট' যন্ত্রের মাধ্যমে হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ অংশের উচ্চতা মাপার প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু নেপাল সরকার বিদেশিদের তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি প্রাথমিক ভাবে না দিলেও বারবার অনুরোধে অনুমতি দেয়। ফলে ১৮৩০ সাল নাগাদ হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ থেকে সর্বোচ্চ অংশের উচ্চতা মাপার কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই স্যাঁতস্যাঁতে নদীবিধৌত তরাই অঞ্চলে মশার উপদ্রবে এবং ম্যালেরিয়ার দাপটে তিনজন সার্ভেয়ারের মৃত্যু এবং একাধিক অফিসার অসুস্থ হয়ে পড়লে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর ১৮৪৭ সাল নাগাদ পুনরায় উচ্চতম অংশ নির্ণয়ের পর্যবেক্ষণ শুরু হয় সার্ভেয়ার জেনারেল অ্যান্ড্রু ওয়াসের নেতৃত্বে। এই সময় পর্যবেক্ষণ দলের এক সদস্য জন আর্মস্ট্রং হঠাৎই আবিষ্কার করেন কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকেও এক উঁচু পর্বতশৃঙ্গ এবং এটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'পিক বি'। তবে এই 'পিক বি'-র সঠিক উচ্চতা তাঁরা কোনো মতেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এরপর জেমস নিকলসন নামে এক সার্ভেয়ারের নেতৃত্বে পাঁচটি স্থান থেকে বিশালাকার 'থিওডো লাইট' যন্ত্রের সাহায্যে ৩০টি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে 'পিক বি'র গড় উচ্চতা নির্ণীত হয় ৯,২০০ মিটার এবং প্রমাণ হয় এটি কাঞ্চনজঙ্ঘার (৮,৮৪৯ মিটার বা ২৮,১৫৬ ফুট) থেকেও উঁচু। এরপর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নিকলসন ফিরে এলে পরবর্তী সার্ভেয়ার মাইকেল হাসি এই 'পিক বি'র নামকরণ করেন 'পিক xv' কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তাঁরা 'পিক iv' হিসাবে চিহ্নিত করতেন।

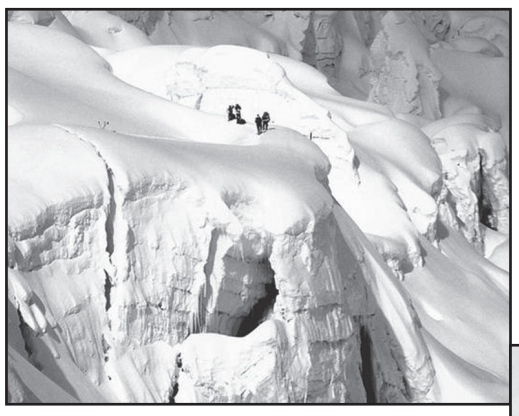

পরবর্তীকালে ১৮৫২ সালে বাঙালি গণিতজ্ঞ এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্মী রাধানাথ শিকদার ত্রিকোণমিতির সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণা করে বিশ্বের সর্বোচ্চ এই শৃঙ্গ বা 'পিক বি' বা 'পিক xv'-এর উচ্চতা নির্ণয় করেন। তবে এটিই যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তা নিশ্চিত করতে আরো গবেষণা চলে। এরপর ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে সার্ভেয়ার ওয়াঘ এই শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,০০০ ফুট নির্ণয় করেন। এবং আরো নিখুত হওয়ার জন্য ২৯,০০২ ফুট ধরে সরকারি ভাবে ঘোষণার জন্য কলকাতার ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টারে চিঠি পাঠান। সরকারি ভাবে ২৯,০০২ ফুট ঘোষণা করার পর সার্ভেয়ার ওয়াঘের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হয় 'পিক xv'-এর একটি নামকরণ করার। বিভিন্ন প্রস্তাব, বিতর্কের পর ওয়াঘ ভারতের প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল *জর্জ* এভারেস্ট-এর নাম অনুযায়ী 'পিক xv'-এর নামকরণ করেন 'মাউন্ট এভারেস্ট'। ১৮৫৬ সালে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এই নামটি সরকারি ভাবে গ্রহণ ও ঘোষণা করে। এর বহু বছর পর ১৯৬০ সালে নেপাল সরকার মাউন্ট এভারেস্টের স্থানীয় ভাষায় নামকরণ করে 'সাগরমাতা' বা 'সাগরমাথা'। ২০০৫ সালের ৯ অক্টোবর 'চাইনিজ আকাডেমি অফ সায়েন্স এন্ড স্টেট ব্যুরো অফ সার্ভেয়িং এন্ড ম্যাপিং' বিভাগ ঘোষণা করে মাউন্ট এভারেস্টের সর্বোচ্চ শিলা পর্যন্ত উচ্চতা ৮,৮৪৪.৪৩ (± ০.২১ মিটার) বা ২৯,০১৭.১৮ ফুট। তবে চূড়ায় তুষারের উচ্চতা ৩.৫ মিটার ধরলে এভারেস্টের মোট উচ্চতা দাঁড়ায় ৮,৮৪৮ মিটার।

রহস্যময় এই এভারেস্ট জয়ের ইচ্ছা প্রায় প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষেরই মনের মধ্যে দানা বেঁধে থাকে। প্রতিবছর বিশ্বের বহু পর্বতারোহী এই ইচ্ছা সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিব্বত ও নেপালে জড়ো হয়। এভারেস্টের শীর্ষে উঠার দুটি পথ রয়েছে - নেপালের দিক থেকে দক্ষিণ শৈলশিরা এবং তিব্বত বা চিনের দিক থেকে উত্তরের শৈলশিরা। দক্ষিণ শৈলশিরা পথটি অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম এবং বেশিরভাগ পর্বতারোহী এই পথটি ধরেই এভারেস্টে চড়েন। এভারেস্ট অভিযানের সবচেয়ে ভালো সময় এপ্রিল-মে মাস। তবে কোনো কোনো অভিযাত্রী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও অভিযান করে থাকেন।

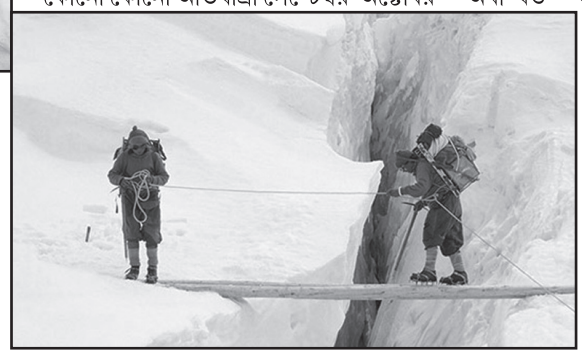

দক্ষিণদিকের শৈলশিরাটি শুরু হয় ৫,৮৩০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বেস ক্যাম্পের কাছে। অভিযাত্রীরা কাঠমাণ্ডু থেকে লুকলা (২,৮৬০ মিটার) হয়ে নামচে বাজারের মধ্য দিয়ে ৬-৮ দিনে বেস ক্যাম্পে পৌঁছে বেশ কিছুদিন তাঁবুতে থেকে অতি-উচ্চ আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর খুম্বু হিমবাহের ক্যাম্প হয়ে ৬,০৬৫ মিটার উচ্চতায় 'ক্যাম্প-১'-এ পৌঁছান। এরপর ৬,৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত 'ক্যাম্প-২'-এ বা অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প (ABC)তে পৌঁছান। মাঝপথে পেরিয়ে আসেন 'ভ্যালি অফ সাইলেন্স' নামের উপত্যকা। এরপর অভিযাত্রীরা 'ক্যাম্প-২' থেকে লোৎসে ফেস পর্যন্ত পৌঁছান দড়ির সাহায্যে এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে গিয়ে 'ক্যাম্প-৩' তৈরি করেন। এখান থেকে ৫০০ মিটার উচ্চতা আরোহণ করে 'ক্যাম্প-৪'-এ, যেটি 'সাউথ কল'-এর কাছে অবস্থিত, পৌঁছান। 'ক্যাম্প-৩' এবং 'ক্যাম্প-৪'-এর মধ্যে 'জেনেভা স্পার' এবং 'ইয়েলো ব্যান্ড' নামের দুটি দূর্গম ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা অভিযাত্রীরা অতিক্রম করেন। ৭,৯২০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সাউথ কলে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীরা 'ডেথ্ জোন'-এ ঢুকে পরেন। এখানে পৌঁছানোর পর ২-৩ দিন সময় পান শৃঙ্গ জয়ের জন্য। অক্সিজেনের অভাব, হঠাৎ হঠাৎ তুষার ঝড় যে কোনো মুহূর্তে অভিযাত্রীদের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। এখনও কয়েকজেন অভিযাত্রী এখানে বছরের পর বছর ধরে প্রাণহীন অবস্থায় অবিকৃত পড়ে আছেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে চূড়ান্ত যাত্রা শুরু করা যায়, নাহলে এখান থেকেই অভিযাত্রীদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। 'ক্যাম্প-৪' থেকে ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে শেষ ১,০০০ মিটার পথ পেরিয়ে শৃঙ্গ জয় করে ফিরে আসতে হবে। এই পথের মধ্যে আরোহীরা প্রথমে ৮,৪০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত 'ব্যালকনি' নামের জায়গাটিতে বিশ্রাম নিয়ে একেবারে শেষ পর্যায়ের ভীষণ দূর্গম পথ অতিক্রম করে ৮,৭৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি গম্বুজাকার বরফের স্তুপে পৌঁছান যেটি 'সাউথ সামিট' নামে পরিচিত। সাউথ সামিট থেকে ছুরির ফলার মতো 'করনাইস ট্রাভার্স' নামের দুর্গম অঞ্চলটি দিয়ে আরোহীরা এভারেস্টের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছান যেখানে সামান্য অসতর্ক হলেই প্রায় ২,৪০০ মিটার গভীর খাতে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য। এই করনাইস ট্রাভার্স-এর একেবারে শেষে ১২ মিটার একটি খাড়াই ঢাল পেরোতে হয়। এটি 'হিলারি স্টেপ' নামে পরিচিত। উত্তরের পথটি আরো দুর্গম। সেই কারণেই সেই পথ এড়িয়ে চলেন অভিযাত্রীরা। তবে এখন এভারেস্টে চড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে বিশাল খরচের বহর। মোটামুটিভাবে আরোহী পিছু ৪০,০০০ থেকে ৮০,০০০ ডলার খরচ পড়ে।

(আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হবে কীভাবে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানিকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে পায়ের ভৃত্য করেছেন অভিযাত্রী দেবদাস নন্দী।)

হবি

কাগজ কাটিং সংরক্ষণ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

‘হবি’, কত রকমের যে হতে পারে তার গোনাগুনতি নেই, ডাকটিকিট জমানো কিংবা দেশ-বিদেশের টাকা পয়সা জমানো - এসব তো অনেকেরই জানা, অনেকেই করে। কেউ বা বাস-ট্রামের টিকিট জমিয়ে মজা পায়। কেউ কেউ বা দেশ-বিদেশের দেশলাই বাক্সও সংগ্রহ করে। কেউ নামী শিল্পীদের ছাপা ছবি সংগ্রহে রাখে। ছোটোবেলা থেকেই হবির অভ্যেসটা গড়ে ওঠা ভালো। ভালো বলেই বাবা-মায়েরাও যুগিয়ে যায় উৎসাহ। কোনো একটা কাজে মন দিয়ে লেগে থাকার অভ্যেস গড়ে উঠলে, সে মনটা অন্য কাজের বেলাতেও কাজে লাগে। তোমাদের যার যেমন ভালো লাগে, সেই ভালো লাগাতেই হবি-র অভ্যেসটা গড়ে ওঠে। তোমরা সেই ভালো লাগায় সংগ্রহ করতে পার নানান জিনিস। আমরা কেবল এখানে তোমাদের যুগিয়ে যাব কাজটা করার, ঠিক ঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিয়মকানুন।

এবারে থাকছে - **খবরের কাগজ কাটিং সংরক্ষণ।**

একথা নতুন করে বলবার দরকার পরে না যে অদূর ভবিষ্যতে খবরের কাগজ বিষয়টি মহাফেজখানায় আশ্রয় নেবে। সবকিছুই অনলাইনে মানুষ পড়ে নেবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সেটি না হচ্ছে, ততদিন খবরের কাগজ এবং তার কাটিংয়ের হবি স্বমহিমায় থাকবে। কিন্তু দিনের পর দিন কীভাবে এই খবরের কাগজকে একইভাবে রেখে দেওয়া সম্ভব? একজন্য দরকার পড়বে সামান্য কিছু জিনিসপত্র।

কী কী প্রয়োজন

প্রথমেই প্রয়োজন মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া। এছাড়াও লাগবে প্লেট, চিমটা, জল।

কীভাবে সংরক্ষণ

যে কাগজটিকে সংরক্ষণ করতে চাইছো সেটিকে একটি প্লেটের মধ্যে রাখ। নজর রাখতে হবে যাতে কাগজটির কোনো অংশ ভাঁজ হয়ে না থাকে বা প্লেটের বাইরে না থাকে। এরপর ঐ প্লেটের মধ্যে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া ধীরে ধীরে ঢেলে দিতে হবে। পুরো কাগজটি মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়ায় ভিজে গেলে কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় রেখে দিতে হবে। তারপর কোনো কিছুর সাহায্যে (চিমটার) ভিজে কাগজটিকে তুলে হালকা করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর কাগজটিকে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নজর রাখতে হবে যে কাগজটি যেন পুরোপুরি শুকিয়ে যায়।

একবার শুকিয়ে গেলে এই উপায়ে কাগজটিকে ২০০ বছর পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

অঙ্কের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে সংখ্যা। তোমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের সংখ্যার কথা জানো। জোড় সংখ্যা, বিজোড় সংখ্যা, ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, বৃহত্তম সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা ইত্যাদি শুনেছ। এটাও তোমরা জানো শূন্য থেকে শুরু করলে সংখ্যার শেষ কোথায় কেউই বলতে পারবে না, আবার দুটি সংখ্যার মাঝেও রয়েছে অসীম সংখ্যক সংখ্যা। অর্থাৎ সংখ্যা সীমাহীন বা অসীম। এই সীমাহীন সংখ্যার মাঝে কিছু সংখ্যাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় বা চিহ্নিত করা হয়। এর মাঝেই রয়েছে বহু পরিচিত পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাগুলি। আজ এখানে তোমাদের সামনে অন্য কিছু রকমের সংখ্যার ধারণা দেব।

* প্রথমেই বলি ধনাত্বক ও ঋণাত্বক সংখ্যার ধারণা কিন্তু সংখ্যা ব্যবহারের শুরু থেকে ছিল না। শূন্য আবিষ্কারের পর থেকে ধনাত্বক ও ঋণাত্বক সংখ্যার প্রচলন।

* যে সংখ্যাকে সেই সংখ্যা এবং ১ ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাকে বলে মৌলিক সংখ্যা। যেমন ১,২,৩,৫,৭,১১, ইত্যাদি। তোমাদের জেনে রাখার সুবিধার্থে বলি, ১৯৬৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গণিত বিশারদ জন ব্রাউন ও তার সহযোগী গণিতজ্ঞরা মিলে এই মুহূর্তে সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যাটি আবিষ্কার করেন। সংখ্যাটি $(2^{২১৬১৯৮}x-৩৯১৫৮১)-১$। একক-দশক করে এর অঙ্ক সংখ্যা ৬৫,০৮৭ টি। এর আগে বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার আবিষ্কারক ছিলেন ইলিয়াক। তাঁর সংখ্যাটি ছিল $২^{১১২১৩}-১১$। ১৯৫২ সালে আর এম রবিনসন বিশাল বিশাল অঙ্কের পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার খোঁজ দিয়েছিলেন। সেগুলি হল $২^{৫২১}-১$, $২^{৬০৭}-১, ২^{১২৭৯}-১, ২^{২২০৩}-১, ২^{২২৮১}-১$। আরও আগে ১৯২৭ সালে ফকিনবার্গ খোঁজ দিয়েছিলেন $১২^{১২৭}-১$ মৌলিক সংখ্যাটির। বুঝতেই পারছ এই ধরনের মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বার করা কতটা কঠিন, পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্যও বটে। পরবর্তী অংশে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আরো কিছু আমরা জানবো।

ছন্দে আনন্দে

পুষ্যি বৃত্তান্ত

পৌলমী ঘোষ

আয়তো সই, দুটো কথা কই -
জবর গল্প, নয় বানানো মোটেই
বুড়ি ঠাম্মা পাশের বাড়ির
পাড়ার সকলের সাথেই আড়ি।
সঙ্গী বলো, ছেলেপুলে বলো
ম্যাও তার পনেরো কি ষোলো!
আরো আছে গোটা আট
ছানা-পোনা ফিটফাট -
গায়ে জামা, চোখেতে কাজল।
হুলোগুলো কোন্দল করে
খিদে পেলে ঠাকুমার পায়ে গিয়ে ধরে।
চুমকি দেওয়া খাগরা মাথায় ফিতে
মেনিগুলোকে বেশ দেখতে
ল্যাজ দুলিয়ে বাচ্চা সামলায়।
সুন্দরী-বান্দরী-আইবুড়ো-ঘোতন
এইসব নামে ঠাম্মা ডাকে ইচ্ছেমতন
সবে মিলে দেয় সাড়া যেন কোরাসের ধরন।
ম্যাও-ঠাম্মার আরো গল্প,
সময় হলে পরে বলবো
এখন তবে চলি।

খোকার প্রশ্ন

সাগর ভট্টাচার্য

স্বপ্ন আমার হলো যে সত্যি,
প্রাণের খেয়া পেল যে মুক্তি
মানে না বারণ, শোনে না শাসন
পড়ালেখায় থাকে না যে মন।
বড়োরা সবাই বলে খালি ভাই
আমি নাকি ভারি দুষ্ট!
নিরালায় বসে করি যে খেলা,
কলরবে শুধু ভরি সারা বেলা
এমন কী আর দুষ্ট।
যখন আমার শিক্ষকমশাই
পড়া যে ধরেন, দেন যে ধোলাই
পড়া যে পারি না আমি কী করি
শিক্ষকমশাই শিখাতে না পারে।
দুষ্ট বলেই খালাস সবে
দায়িত্বটা এড়িয়ে যাবে
সঠিকভাবে বুঝলে পরে
মুখস্থ কি করতে লাগে?

মুরগি, হাঁসের কথা

তাপসকিরণ রায়

মুরগি বলে, হাঁস ভাই,
তোমার, প্যাঁক প্যাঁক করা ছাড়া
আর কি কোনো কাজ নাই?
তোমায় যখনি দেখি
ডোবায় কিম্বা পুকুরে
এপার ওপার সাঁতরে বেড়াও
সকাল, বিকাল, দুপুরে।
বলি একটু তো দাঁড়াও,
দুটি কথা বলতে
বন্ধুত্বের হাত বাড়াও।

- প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক, বলে হাঁস
দাঁড়াবার আমার নেই অবকাশ।
ডাঙাতে বেশি থাকতে না চাই,
ধরবে কুকুরে থামি না যে তাই!
পায়ের অনুপাতে শরীর বড়ো ভারি,
চলতে পারি না তত তাড়াতাড়ি।
তাই তো পা চালাই -
ডাঙা ছেড়ে শিগগিরি পালাই।
অথচ জলাশয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার আমার,
সেখানে দ্রুত গতি ছুটি চলি অপার।
মুরগি বলে হাঁসকে ডেকে,
অন্য আর একদিন -
আমারও তো নিন্দা করো তুমি,
বলো আমার ডাক চিকন, বড় ক্ষীণ।
বলো, আমি চলি ঝটপট -
স্বভাব আমার আমার ছটফট?
দেখো আমাদের পুরুষ মোরগ -
দেখতে সতেজ, দেখতে নীরোগ।
রঙিগন দেহের লাল ঝুঁটিতে
এদিন ওদিক ছোটাছুটিতে
বেশ ওরা তৎপর।
সকাল বেলার, কুকুর-কু স্বর
সত্যি সুখকর।
তারই ডাকে সবাই জাগে,
জেগে ওঠে সব ঘর।
হাঁস বলে, দেখ আমাদের রাজহাঁস,
চলার ভঙ্গিতে সদ্য উদ্ভাস -
যেন কোনো পক্ষীরাজ
আকাশ জুড়ে উড়বে আজ!
তবু মানছি কথা তোমার,
তোমরা আমরা সবাই ভালো
নিজের জগতে যার যার।

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুমবুম আর ঈগল রাজার মুকুট

ছয় বছরের ছোট্টো ছেলে বুমবুম ঘটিয়ে চলেছে একের পর এক কাণ্ডকারখানা। 'বুমবুম আর দুষ্টু জাদুগর'-এর পর বুমবুমের এটি দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার।

বিবেক কুণ্ডু

গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে কুচকুচে কালো দুই চিতাবাঘ। বেজায় খিদে পেয়েছে দুজনের, কিন্তু নড়বার উপায়টি নেই। ভেতরে এখন গোপন মিটিং চলছে। বুড়ো আর জুডোকে খটাখট রেখে গেছে পাহারায়। বলে গেছে কাউকে যদি গুহার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখিস, সোজা ঘাড় মটকে দিবি। সেই থেকে দু'জনে নজর রেখেছে চারপাশে, একটা গিরগিটি আর একটা গিনিপিগ ছাড়া কাউকে দেখতে পায়নি।

গিরগিটি তো পুঁচকে এইটুকু প্রাণি, তাই ওকে নিয়ে চিন্তা নেই। তাছাড়া ওর গায়ের রংটা প্রায় গুহার রঙেরই মতন, তাই ধরতে গেলেও মিশে যাবে। গিনিপিগটাকে অবশ্য খপাত করে ধরতে গিয়েছিল, বুড়ো, কিন্তু সে লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে দূরে পাথরের খাঁজে সেই যে লুকিয়ে পড়ল, তাকে আর দেখতেই পাওয়া গেল না।

সেই থেকে খিদেটাও পেয়ে গেছে খুব। কিন্তু সঙ্গে কোনো খাবার নেই। তাই এখন খেতে গেলে ধরতে হবে একটা টগবগে হরিণ আর তা না পেলে অন্তত একটা ছটফটে খরগোশ। সেটা করতে হলে কিছুক্ষণের জন্য গুহার সামনে থেকে সরতে হবে। আর খটাখট যদি তা জানতে পেরে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই, দু'জনের চোখ একেবারে উপড়ে নেবে। তাই চুপচাপ পাহারা দিচ্ছে দু'জনে। আশেপাশে কাউকে দেখলেই সোজা ঘাড়টি মটকে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আর কেউ এল না গুহার কাছে। এদিকে গুহার দরজা এখনো খুলছে না। খটাখট ছাড়া আর কে কে এই গুহার ভেতরে আছে, সেটা জানবার খুব ইচ্ছে ওদের। তারা কী কথা বলছে তা জানবার ইচ্ছেটাও কম নয়।

একটু আগে গুহার দরজায় উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছিল জুডো, একটা হলুদ-কমলা আলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। তা দেখে বুড়ো খিকখিক করে হেসে বলল, 'তোর যেমন বুদ্ধি! ওভাবে উঁকি মেরে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে গুহার ভেতরের কথাবার্তা শোনা যাক।' একথা বলে বুড়ো সোজা একটা কান রাখল গুহার দেওয়ালে আর অন্য কানটা চাপা দিল থাবা দিয়ে। শোনবার চেষ্টা করল ভেতরের কথা।

বুড়োর কাছে জুডো জানতে চাইল, 'শুনতে পাচ্ছিস?'

'না। এভাবে হবে না। ওই যন্তরটা লাগাই।' ব্যাগ থেকে একটা কালো রঙের নল বের করল বুড়ো।

নলটার একদিক সরু, অন্যদিক মোটা। মোটা দিকটায় স্টোভে কেরোসিন তেল ভরবার ফানেলের মতন একটা জিনিস লাগানো। সেই জিনিসটা গুহার দরজার গায়ে ঠেকাতেই আঠার মতো সেঁটে গেল। তারপর সরু দিকের নলটা এক কানে গুঁজে নলটার গায়ে লাগানো গোল বোতামটা আঙুল দিয়ে একটু ওদিক ঘোরালো বুড়ো। আস্তে আস্তে ওর মুখে ফুটে উঠল হাসি।

জুডোর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলল বুড়ো, 'আমি হলাম বুড়ো দি গ্রেট। আমি পারি না এমন কাজ নেই। এই যন্তরটায় এবার কান লাগিয়ে দেখ। নলের ওপরের গোল বোতামটা ঘুরিয়ে শব্দকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া যায়।'

যন্তরটা কানে গুঁজে জুডো তো অবাক! কারুর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, একটু গমগমে কিন্তু পরিস্কার।

'খাসা জিনিস। কোথায় পেলি এটা?' - জুডো জানতে চাইল।

বুড়ো বলল, 'খটাখটের বাক্সে। শুনেছি এটা পানিনি বানিয়েছেন।'

জুডো জিজ্ঞাসা করল, 'পানিনি! মানে যিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব যন্তর তৈরি করেন? ওই যে কি বলে বৈ-বৈ-বৈ ...'

'বৈজ্ঞানিক।' হাসতে হাসতে বলল বুড়ো, 'লেখাপড়া না করলে কী হয় দেখছিস তো, একটা সহজ কথা বলতে পারছিস না। নে, এবার গুহার ভেতরের কথা ঠিকঠাক শুনতে পাস কিনা দেখ। না পেলে বোতামটা একটু ঘুরিয়ে নিস।'

জুডো আবার নলটা গুঁজল কানে। শব্দ আসছে, কিন্তু ঘড়ঘড় করে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নলের পাশের বোতামটা একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই গুহার ভেতর থেকে ভেসে এল অচেনা কারুর গলার পরিস্কার আওয়াজ, 'তাহলে তো খুব মুশকিল! আমাদের যে অনেক বাধা। এখন উপায় কী হবে মহারাজ?'

এবার শোনা গেল খটাখটের বিশ্রি খ্যানখ্যানে গলা, 'চুপ করো দিগগজ। বোকার মতো কথা বোলো না। মহারাজ বললে সব বাধা দূর করে ফেলব আমরা। কী করতে হবে শুধু বলে দিন মহারাজ, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। সবুজ পাহাড়ে সবাই হবে আমাদের প্রজা। সবাই ভয় পেয়ে চলবে আমাদের।'

জুডো শুনে চমকে উঠল। এ কী বলছে খটাখট! সবুজ পাহাড়। সে তো আবছাই নদীর ওপারের বিশাল দেশ।

অন্য কেউ খক-খক করে হেসে বলল - 'ওখানে শুনেছি ছাগল, ভেড়া, হরিণ, বাইসন অনেক। চাইলেই মুখের সামনে খাবার এসে যাবে।'

'মূর্খ', ভয়ংকর গলায় গুহা কাঁপিয়ে কে যেন বলে উঠল - 'খাবার চিন্তা করে চলছে সারাদিন। আমার চাই সবুজ পাহাড় আর তার সিংহাসন। ওখানকার দুর্গে কড়া পাহারা আছে বটে কিন্তু তাদের বোকা বানানো কঠিন হবে না। কীভাবে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেব। ওখানে বেশ কিছুদিন ধরে রাজার শরীর খারাপ। রাজপুত্তুর গুরুর আশ্রমে, তার লেখাপড়া শেষ হয়নি এখনো। এটাই সুযোগ আমার রাজা হওয়ার। ওখানের প্রজারা এতদিন দেখেছে বন্ধু রাজা, এবার দেখবে দুষ্টু রাজার দুষ্টুমি। শুধু একটি জিনিস আমার রাজা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। এখন বলো পারবে কিনা?

এ গলাটা শুনে বেশ ভয় করতে লাগল জুডোর। বুড়োর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কিরে তুই নিজেই তো সব শুনে নিচ্ছিস। এবার যন্তরটা দে আমিও শুনি।'

জুডো মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'শ্‌শ্‌, চুপ কর। খুব গোপন কথা হচ্ছে। এখন শুনলে বুঝবি না। তার চেয়ে আমি পুরোটা শুনে তোকে বলছি।'

নলের মধ্যে শোনা গেল খটাখটের গলা -

'কী সেই জিনিস মহারাজ? আমরা ঠিক তা নিয়ে আসব। আপনি বলুন।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কোনো আওয়াজ নেই।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর গলা ধীরে ধীরে বলে উঠল, 'মুকুট। একটা বিশেষ মুকুট চাই আমার। ঈগল রাজার মুকুট।'

ব্যস, এরপর আর কোনো কথা শোনা গেল না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর নল থেকে কান সরিয়ে জুডো বলল, 'মনে হচ্ছে ওদের মিটিং শেষ। এবার যন্তরটা সরিয়ে ফেল।'

যন্তরটা ব্যাগে পুরে বুড়ো বলল, 'এবার চটপট বল কী শুনলি। খটাখট এসে যাবে এক্ষুনি। তবে একদম আস্তে বল, কেউ যেন শুনতে না পায়।'

(আবার পরের সংখ্যায়)

শুরু হয়েছে খেলা নিয়ে আকর্ষণীয় এক কলম। একটু অন্যরকম। হবেই। শুধু মনে নয়, মননেও দাগ কাটবে। খেলা মানে, শুধু খেলাই নয়, খেলার আগে, পিছে বা সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজাটাকে তুলে ধরাই এই কলমের মূল লক্ষ্য। - **কিচির মিচির**

অবাক খেলা

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় লড়াই আছে, থাকবেও। কিন্তু হিংসুটেপনার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ 'কিচির মিচির'-র প্রথম সংখ্যায় এই ধারাবাহিক লেখায় শুধুই ফুটবলের উল্লেখ থাকার জন্য মৃদু অভিযোগ করেছেন। সবিনয়ে জানাই কোনো বিশেষ ভাবনায় ফুটবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন এবার থেকে শুধুই ফুটবল নয়, নানা ধরনের খেলার উল্লেখ এই পাতায় থাকবে। এবং ছোটো-বড়ো ঘটনাগুলোর একটা শিরোনামও দেওয়া হবে।

করমর্দন

বর্ণবিদ্বেষ ও যুক্তিহীন বদ্ধমূল ধারণা মানুষকে কখনো উদার করেনা। অ্যাডল্ফ্ হিটলারকেও করেনি। খেলাধূলার মাঠে তাঁর আচরণ আজও একটা চরম দুঃখজনক ঘটনার স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে আছে। ১৯৩৬ সালে জার্মানির বার্লিন-এ অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস-এ আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলিট স্বর্ণপদক জিতে সারা ফেলে দিলেও হিটলার কৃষ্ণকায় দৌড়বীরের সঙ্গে করমর্দন করেননি। কারণ হিটলার মনে করতেন শ্বেতকায় আর্যরাই সর্বদা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য।

ক্রিকেট বিরোধী গরু

মানুষের এই পৃথিবীতে গরুরাও দিব্যি বেঁচে থাকে এবং ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। এবং সাধারণতভাবে গরুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার কোনো বিরোধ নেই। একদা অবশ্য একটা অন্যরকম ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডশায়ারের কাছে পেন্টেনস্টল-এ একটা স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল। ব্যাটসম্যানদের যা কাজ, সজোরে একটা বল মারতেই বলটা পাশের মাঠে চলে গেল। সেখানে একটা গরু চরে বেড়াচ্ছিল। তার নাম Bessie। সে বিনা প্রতিবাদে তার মুখের কাছে গড়িয়ে আসা বলটা গম্ভীর ভঙ্গিতে খেয়ে ফেলল। খেলাও গেল বন্ধ হয়ে। কারণ সেটাই ছিল স্থানীয় ক্লাবটির একমাত্র ক্রিকেট বল।

ভবিষ্যৎবানী

ভবিষ্যৎবানী করার ইচ্ছে অনেকের মধ্যেই প্রবল ভাবে জেগে থাকে। কিন্তু মজা হচ্ছে, কারো কারো ক্ষেত্রে সেই ভবিষ্যৎবানী একেবারে হাসির কথা হয়ে দাঁড়ায়। ইংল্যান্ডের একটা ফুটবল ক্লাবের নাম- উলভস্ (Wolves)। সেখানকার ম্যানেজার মেজর বার্কলে (Major Berkley) তরুণ ফুটবলার বিলি রাইট (Billy Right) -কে দেখে বলেছিলেন বিলির চেহারাটা এতই ছোটোখাটো যে তার পক্ষে কখনো পেশাদার ফুটবলার হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটা হয়েছিল একটু অন্যরকম। বিলি রাইট ইংল্যান্ডের পক্ষে মোট ১০৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন। এবং তার মধ্যে ৯০টা ম্যাচে তিনিই ছিলেন দলের অধিনায়ক।

নেমেই সেঞ্চুরি আর সেঞ্চুরি

কখনো কখনো টেস্ট সেঞ্চুরির সঙ্গেই রেকর্ড গড়ার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তবে টেস্ট-ক্রিকেটে খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করার প্রশ্নে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো-র রেকর্ডটা একটু অন্যরকমের। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার। সফররত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন রো। দলের তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে লরেন্স ক্রিজে গিয়ে নিজের স্বভাব ও ইচ্ছে অনুযায়ী পিটিয়ে খেলে তিনি করলেন ২১৪। তাঁর দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪ উইকেটে ৫০৮ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করল। দ্বিতীয় ইনিংসে লরেন্স রো আবার ১০০ রান করে অপরাজিত রইলেন, ওই তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবেই। টেস্ট খেলতে নেমেই দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করার এমন কৃতিত্ব এখনও পর্যন্ত আর কেউই দেখাতে পারেননি।

৯ জন মিলে ৩ রান

এখনও টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস খেলেছে নিউজিল্যান্ড। ১৯৫৫-র মার্চ-এ নিজের দেশে অকল্যান্ড-এ তারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে মাত্র ২৬ রান করেছিল। ৬ জন ব্যাটসম্যান ০ রান করেছিলেন (একজন ৩ রানে অপরাজিত), ৩ জনের রান ছিল ১ এবং একজনই মাত্র দু' অঙ্কের রান (১১) করেছিলেন (তিনি বার্ট সাটক্লিফ)।

দাবা হোক পড়াশোনার একটা অঙ্গ

চেস দাদু

দাবা চর্চা। ধারাবাহিকভাবে এই কলমটি তোমাদের জন্য লিখবার দায়িত্ব আমার উপরে পড়েছে। যখন লেখার অনুরোধ নিয়ে আমার সঙ্গে 'কিচির মিচির' যোগাযোগ করে, তখনই আমি কিছু শর্ত দিয়েছিলাম। তারমধ্যে শুরুতেই যে কথাটা বলেছিলাম, তা হল - দাবা খেলা শুধুমাত্র মগজের বিষয় নয়। দাবুড়ুর থাকতে হয় চূড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতা। অনেকেই হয়তো কথাটা শুনে অবাক হন, কিন্তু এই সত্যিটাই আমি প্রথমে তুলে ধরতে চাই বলে 'কিচির মিচির'-এর সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলাম।

খুদে বন্ধুরা আমি তোমাদের Chess দাদু। দাবা খেলা নিয়ে কিছু বলার আগে কতগুলি কথ মন দিয়ে শোনো।

পড়াশোনা করবে, খেলাধূলা করবে এবং এ দুটির সঙ্গে দাবা চলবে। ঠিক যেন একটা বিষয় হিসাবে - মানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দাবা একটা পড়াশোনার অঙ্গ হিসাবে দেখবে। ধরা যাক, তুমি দশটা অঙ্ক করে এবার ইতিহাস পড়বে ঠিক করেছ, তেমনি দাবা নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতে হবে।

আমার চেনাজানা একটি ছেলে দাবাতে জুনিয়র ন্যাশনাল পর্যন্ত খেলেছিল। কোনো কারণে সে দাবা আর খেলতে পারেনি এবং সে বলেছিল জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাবা খেলা তাকে সমৃদ্ধ করেছে। দাবা খেললে বুদ্ধির যে পরিচর্যা হয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে দাবা খেলা স্কুল পর্যায়ে নেওয়া হচ্ছে কারণ আনন্দের মধ্যে থেকে বুদ্ধিকে শাণিত করার একটি উপায় হিসাবে অনবদ্য এই খেলা।

বিশ্বের প্রায় সবাই একমত এই খেলা ভারত থেকেই বিস্তার লাভ করে। প্রথমে এর নাম ছিল চতুরঙ্গ। কিন্তু আমজনতার খেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় রাশিয়াতে। এখন সব দেশেই এই খেলার প্রচার ও প্রসার চলছে।

কলকাতা এবং তার আশেপাশে অনেক দাবা স্কুল চালু আছে। তোমরা সময় করে সে সুযোগ নিতে পারো। এছাড়া অনেক প্রশিক্ষক বাড়িতে গিয়ে দাবা শেখান।

বাড়িতে কেউ দাবা জানলে তাঁর কাছ থেকেই প্রাথমিক পাঠ তোমরা নিতে পারো। অল্প বয়স থেকে দাবা খেলেছেন তারা এখন দাবাড়ু হিসাবে অনেক নাম করেছেন, এই বাংলায় এমন দাবা খেলোয়াড় অনেক আছেন। খুব শান্ত ভাবে দাবা খেলতে হবে। উত্তেজিত হলে চলবে না। **একটা 'গেম' তুমি হারতে পার কিন্তু পরে আবার তুমিই জিতবে। শেখার মানসিকতা রাখতে হবে।** প্রতিপক্ষের ভুলে তুমি সহজে খেলাটি জিতে নিলে, এতে খুব একটা লাভ হবে না। বরং তুমি দেখো সে ঠিক চাল দিলে তুমি কী করতে।

এবার একজন বড়ো দাবাড়ুর কথা বলি। তাঁর নাম মিখাইল তাল। রাশিয়ার মানুষ ছিলেন মিখাইল। তাঁর খেলা এতো সুন্দর ছিল যে বলা হতো মিখাইল দাবা বোর্ডে যেন কবিতা লিখছেন। কিছুদিন আগে গোর্কি সদনে এ্যালেখিন চেস ক্লাবে বেশ কয়েকবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ এসেছিলেন। সেখানে একটি প্রশ্নোত্তরের আসরে তোমাদের চেস দাদু প্রশ্ন করেছিলো আনন্দকে বর্তমান দাবা খেলার জগতে মিখাইলের মতো খেলা কি বাস্তবোচিত। আনন্দ উত্তরে বলেছিলেন, কেউ কেউ মিখাইলের মতো খেলতে চায় কিন্তু তাঁর মতো খেলা খুবই বিরল। বুঝতে পারলে একজন দাবাড়ু যে দাগ রেখে গেছেন তার কত সম্মান। তোমরা খেলা শিখে এই ধরনের সম্মানের কারণ হবে না কে বলতে পারে! মিখাইল ছিলেন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক দাবাড়ু। অথচ সে আক্রমণ যেন একটা ছন্দে বাধা থাকত। সেজন্য তিনি আজও দাবা জগতে এমন সমাদৃত।

যাঁরা বড়ো দাবাড়ু মানে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন, দেখা যাবে প্রত্যেকেই অল্প বয়সে দাবা শেখা শুরু করেছিলেন। আমাদের বাংলায় যে সমস্ত খুদে দাবাড়ু ভালো খেলছে তাদের খবর এই কলমে দেওয়ার চেষ্টা করব।

যারা এখনও দাবা বোর্ড বাড়িতে আনতে পারনি তারা বাবা, মা বা যিনি অভিভাবক তাঁর সম্মতিতে একটা বোর্ড এনে বসে যাও। অন্যান্য পড়াশোনার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময় দাবাচর্চা করো। তোমাদের Chess দাদু সবসময় তোমাদের সঙ্গে আছে।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সব ফুল সাদা হয়ে গেছে

সেদিন ছিল ২৪ বৈশাখ। আমরা রাত্রে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'র মহড়া দিয়ে বাড়ি ফিরে খেয়ে শুতে যাচ্ছি, কারণ আমি গান গাইব আর আমার মা কবিতার সঙ্গে নাচ করবে।

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জানালার কাছে গিয়ে দেখি ২৫ বৈশাখের সকালটাকে কেমন লাগে - এমন সময় বাগানের দিকে চোখ যেতেই দেখি বাগানের সব ফুলের রঙ সাদা হয়ে গেছে। এতো শুভ্র, এত সুন্দর সকাল কোনো দিনও দেখিনি। মনে হচ্ছে দৌড়ে বাগানে যাই ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথি। তবে গাঁদা ফুলও সাদা, জবা ফুলও সাদা। সব ফুল এতো সাদা যে ভাবলেও অবাক লাগছে। মালা গাঁথতে পারি না, তাই থালায় করে ফুল কুড়িয়ে নিলাম। এতো সুন্দর গন্ধ, এত সুন্দর সকাল আমি কোনো দিনও দেখিনি। মা ও বাবার একটা কথা বার বার মনে পড়ছে শুভ্র সকাল-সুন্দর সকাল- সুপ্রভাত।

সাদার মতো স্বচ্ছতা, পরিস্কার পৃথিবী যেন সব জায়গায় এত শুভ্রতার আলো ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সবার মনও যেন সুন্দর হয়। এক সময় মনে হলো যেন বাংলা ব্যকরণের বর্ণগুলির মতো স্বচ্ছ - ক, খ, গ, ঘ -

হঠাৎ দেখি মা ডাকছে, কিরে মাটিতে শুয়ে কেন? আমার হাতে রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটি। আমি কখন পড়ে গেছি! স্বপ্ন দেখছিলাম - তাকিয়ে দেখি সকাল হয়েছে। মায়ের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি মা লালপারের সাদা শাড়ি পড়েছে, মাথায় বেল ফুলের মালা, হাতে গীতবিতান, সঞ্চয়িতা ও চন্দনে আঁকা রবিদাদুর ছবি। সকালটা যেন এই সাদা ফুলের শুভ্রতার স্বপ্নে আঁকা রঙ তুলি আমাকে পঁচিশে বৈশাখের শুভ্রতায় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে রইল।

হিতব্রতশ্রী বসু
শ্রেণি : পঞ্চম,
গার্ডেন হাই স্কুল, কলকাতা

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে দেখি চারিদিক সূর্যের কিরণে আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাগানের সব রঙিন ফুল সাদা হয়ে গেছে। কী করে হয়, আমি কি কোনো স্বপ্ন দেখছি, না স্বপ্ন তো নয় এইতো পাশে বাবা, মা সবাই ঘুমাচ্ছে। তাহলে তো সত্যি, কী অলৌকিক ব্যাপার। আমাদের বাগানে একবার একই ডালে সাদা জবা ও লাল জবা দুটোই হয়েছিল। সাদা হল শান্তি, সত্য, ধর্ম, বিবেক, জ্ঞান, শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্রতার প্রতীক। হঠাৎ মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, তাহলে কি জগতে সব দুঃখ, কালিমা, অন্ধকার, কষ্ট দূর হওয়ার সময় এসেছে। পৃথিবীতে এমন কেউ আসতে চলেছে? কোনো মহামানব? তিনি কি জগতের দুঃখ দূর করতে আসছেন? চারিদিকে শান্তি আর শান্তি। 'ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে, রোমাঞ্চ জাগে ...'। আমার এই ভাবনা কি সত্যি হবে? এমন দিন কি আসবে, চারিদিকে কি এই শ্বেত-শুভ্রতা তারই আগাম প্রতীক। 'জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ...

মনস্বিনী ভট্টাচার্য
শ্রেণি : সপ্তম,
জি. ডি. বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন, কলকাতা

মানুষের জীবনে যতই চাহিদা থাক তাদের জীবনের সবথেকে বড়ো চাহিদা শান্তি। শান্তিই কোনো মানুষকে খুশি করতে পারে, মানুষের মধ্যে যদি শান্তি থাকে, তাহলে মানুষের একতা বেড়ে যাবে। আর এই শান্তিরই প্রতীক হল সাদা রঙ।

রবিবার সকাল ৭টা বাজে। ঘুম থেকে উঠে একটা বিরাট বড়ো হাই তুলে চলে গেলাম বারান্দায়। সারা রাত খুব বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা গাছগুলো যেন রোদে ঝকমক্ করছে। ফুলগুলো যেন তাদের উপর পড়ে থাকা বৃষ্টির ফোটাদের টেনে ধরে আছে। বাড়ির সামনেই অনেক গাছ। চোখ রগড়ে প্রথমেই চোখে পড়ল টগর ফুলের গাছটা। তারপর গাছগুলো দেখে আমি অবাক। ও মা! মাধবীলতা, জবা - সব দুধের মতো সাদা হয়ে গেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, এত সুন্দর দৃশ্য যে বলে বোঝানো যাবে না। আমরা প্রায়ই বলি রঙিন সবথেকে ভালো। নিশ্চয় ভালো। কিন্তু এটা ভোলা যাবে না যে সব রঙেরই উৎপত্তি সাদা রঙ থেকে। তাই সাদা রঙ সব পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গেই মানানসই।

সারা পাড়া নিঃশব্দ। শুধু পাখির মিষ্টি গান আর বাতাসের শন্ শন্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারই মধ্যে যেন ফুলগুলো নাচছে। মনে হল সাদা ফুলগুলোকে কেউ রঙ করে বাইরে রেখে ছিল, অমনি বৃষ্টি এসে সব রঙ ধুয়ে দিল। ঠিক যেমন তাজমহল দেখে সবাই অবশ হয়ে যায়। আমিও ঠিক তেমনি চুপ করে বসে বাহির পানে চেয়ে রইলাম। এমনই মায়াবি শক্তি এই সাদার। প্রকৃতি যেন চুম্বকের মতো টেনে ধরে রইল আমাকে। মনে হল ফুলগুলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে থেকে বেরিয়ে, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

দেশে এত অশান্তি দেখে, ঠাকুর যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, দেশে শান্তি থাকলেই আনন্দ থাকবে। তিনি যেন আমাদের বলে দিচ্ছেন, মানুষের জীবনে শান্তি থাকলেই তাদের জীবন রঙিন হয়ে উঠবে। এতদিনে বুঝলাম যে এই কথাটা কতটা সত্যি, 'Flowers are the sweetest things God ever made, but forgot to put a soul into.'

অভীপ্সা বক্সী
শ্রেণি : সপ্তম,
দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল, কলকাতা

আগের বছর শীতের ছুটিতে আমি আমার বাবা এবং মায়ের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার সৌন্দর্য আজও আমায় টানে। আমরা পৌঁছেছিলাম দুপুর একটায়। সেখানে পৌঁছে আমার মনটা আনন্দ উন্মাদনায় ভরে যায়। যেদিকে তাকাই নানা ধরনের নানা রঙের ফুল আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাদের দিকে তাকিয়ে কীভাবে একটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায় তা বুঝতে পারিনি। তারপর অগত্যা ঠান্ডার চোটে ঘরে যেতে হয় এবং সেখানে সন্ধ্যাটা খুবই অস্বস্তিতে কাটে। তারপর খাওয়া সেরে শুতে যাই কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও সেই সৌন্দর্য আমার চোখে ভেসে থাকে। সেই ভাবতে ভাবতে দেখি মা একসময় আমাকে ডাকছে, 'সোনাই, ঘুম থেকে ওঠো দাঁত মাজো।' আমি চোখ খুলে দৌড়ে সেই ফুলগুলোর কাছে চলে যাই এবং সেখানে একরকম বেদনা আমার মনটাকে ছেয়ে ফেলে। যেদিকে তাকাই শুধু সাদা, কোথায় গেল আমার সেই রঙিন ফুলগুলো। গালে হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়ি এবং আগের দৃশ্য মনে করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই সেই সৌন্দর্য আমার মনে আসে না। সবই সাদা মনে হয়। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর মা বলে সুন্দর রোদ উঠেছে। এই শুনে আমি চোখ খুলতেই চমকে উঠি, কী আশ্চর্য ব্যাপার, প্রত্যেকটা ফুল গাছের উপর যেন হিরে থোকায় থোকায় ফুটে আছে। সেই আশ্চর্য জিনিস আমি জীবনে প্রথমবার দেখলাম। যত বেলা বাড়তে থাকে তত হিরের থোকা কমতে থাকে এবং আগের রঙিন ফুলের সৌন্দর্য বেরিয়ে আসে।

কৌস্তভ পাল
শ্রেণি : সপ্তম,
শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, চন্দননগর, হুগলি

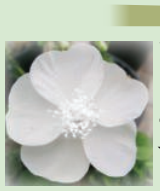

আমার নাম কুর্চি। একটা ছোট্টো সাদা ফুল। যার খুব মিষ্টি গন্ধ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার মা ডান হাতের মুঠো ভর্তি সাদা ফুল দেখিয়ে বলছে, 'এই দেখ কুর্চি ফুল। তোর জন্য এনেছি। শুঁকে দেখ্ কী মিষ্টি গন্ধ। মাকে জড়িয়ে গন্ধটা শুঁকতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ওমা সারা বাড়ি দেখি সত্যি সত্যি ভরে রয়েছে ফুলের গন্ধে। বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ির সামনের লাল কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া ফুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। আর ছাতিম ফুলের মতো মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। এই ফুলের গন্ধটা আমার কেমন খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। বুক ভরে গন্ধটা নিলাম। সাদা ফুলগুলোর বেশিরভাগেরই খুব সুন্দর গন্ধ থাকে। আমাদের ছাদে টবে অনেক গাছ আছে। অনেক রকমের ফুল ফোটে, এক ছুটে ছাদে গিয়ে দেখি বেল, জুঁই, গন্ধরাজের মতো গাঁদা, গোলাপ, সূর্যমুখী সব ফুলের রং সাদা হয়ে গেছে আর খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। পি সি সরকার যেন জাদু কাঠি ছুঁয়ে দিয়েছে ফুলগুলোর গায়ে। সত্যি যদি রঙিন ফুলগুলো সাদা হয়ে যেত আর গন্ধে ভরে যেত আমার তো খুব ভালো লাগত। তোমাদের?

কুর্চি চট্টোপাধ্যায়
শ্রেণি : তৃতীয়,
আওয়ার লেডি কুইন অফ দি মিশন স্কুল, কলকাতা

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ২০মে-র মধ্যে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :

বিশ্বকাপে তুমিই মেসি-রোনাল্ডো

একটি ঝড়ের দিন

পয়লা বৈশাখের আগের দিন বিকেল বেলা আমি মায়ের সঙ্গে দোকানে নতুন জামা কিনতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পরিস্কার আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঝড় উঠল। তারপরে ঝড়ের গর্জন, সঙ্গে বজ্রপাত, দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভয়ংকর এক দৈত্য প্রচণ্ড গর্জন করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। গাছগুলি প্রচণ্ড ভাবে দুলতে শুরু করল। মনে হল যেন উপড়ে পড়ে যাবে। প্রবল বেগে ধুলো উড়তে শুরু করল। আমাদের জামাকাপড় মুখে, চোখে ধুলোয় ভরে গেল। বেশিরভাগ দোকানদার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলেন। কিছু দূরে একটি খোলা দোকান দেখতে পেয়ে আমি আর মা সেই দোকানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল। প্রচণ্ড গরমের পর ঝড়ের জন্য চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এরজন্য আমরা খুব স্বস্তিও বোধ করলাম। এরপরই ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। যেন মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো আমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে জল চাওয়ার প্রার্থনা সফল হল। এরপর আমরা এই বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি চলে এলাম।

রণিৎ চ্যাটার্জি
শ্রেণি : পঞ্চম,
মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়, হুগলি।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি ...

দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন বিকেল ৪টের সময় আমাদের পাড়ার ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ খেলার কথা। আমাদের পাড়ার দাদারা ছিল উদ্যোক্তা। কোনোদিনই আমার ফুটবলে বিশেষ আগ্রহ নেই। তাই সেদিনও ওই ম্যাচ দেখার কোনো মোহ ছিল না।

এমনিতে ম্যাচ দেখার জন্য সেদিন জানলায় বসিনি। সকালে শ্যামজেঠুর দোকানের একটা পেন দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই জেঠুর থেকে পেনটা নিয়ে বলেছিলাম যে বিকেলে টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাব। তাই বিকেল হতেই টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেটাই ছিল আমার সেদিনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। দোকানটা ছিল আমার বাড়ি থেকে থেকে বেশ কিছুটা দূরে। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলাম। পথে আমার বন্ধু জিতের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে কথায় কথায় বেশ কিছুটা সময় বেরিয়ে গেল। তারপর তাকে বিদায় জানিয়ে আবার পথে হাঁটতে শুরু করলাম। পাড়ার পথটা যেন খাঁ খাঁ করছে। আশে-পাশে বাচ্চাদের কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি কিছুই চোখে পরছিল না। সবাই গেছে ফুটবল ম্যাচ দেখতে। হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। মনে হল আকাশে যেন কেউ কালির দোয়াত ঢেলে দিয়েছে। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। গাছে গাছে ঘর্ষণ শুরু হল। বজ্রের ঘর্ষণে ৪-৫টি সুপারি গাছ মাটিতে পড়ে গেল। প্রকৃতি যেন প্রলয় খেলায় মেতে উঠল। তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। আমি দৌড়ে দিয়ে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম। ঝড়-বৃষ্টির দাপটে মনে হয় সেদিনকার ফুটবল ম্যাচ পণ্ড, ছেলেরা বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

এইসব দৃশ্যই নজরে পড়ছিল। ধীরে ধীরে বৃষ্টির দাপট কমতে শুরু করছিল। আমি দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। রাস্তায় দোকানদারকে দেওয়ার জন্য যে টাকাটা নিয়েছিলাম সেটি গেল পড়ে। অল্প হলেও বকুনি খেলাম। বাবা বাইরে বের হতে বারণ করে দিলেন। পরে অবশ্য মনে পড়ল রবিবার বিকেলে দোকানটি বন্ধ থাকে। কিন্তু এই কথাটি গুরুজনের মুখের ওপর বলার সাহস আমার ছিল না। সেই বৃষ্টি যেন আমার জীবনে বৃষ্টি নামাল।

সোমশুভ্র সাহা সরদার
শ্রেণি : পঞ্চম,
মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, হুগলি।

‘কচি পাতা’র পাতায় পাঠাতে পারো তোমাদের লেখা ছড়া, অণুগল্প, লিমেরিক বা তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতার কথা। আমরা গুরুত্ব দিয়ে ছাপবো সেই লেখা। পাঠাতে পারো ছবিও।
লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা -
কিচির মিচির
৯ কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১। পাঠাতে পারো ই-মেলেও।

আঁকি-বুঁকি

মেধা নাগ
শ্রেণি - দ্বিতীয়,
শিশু বিদ্যামন্দির, বেথুয়াডহরি, নদিয়া

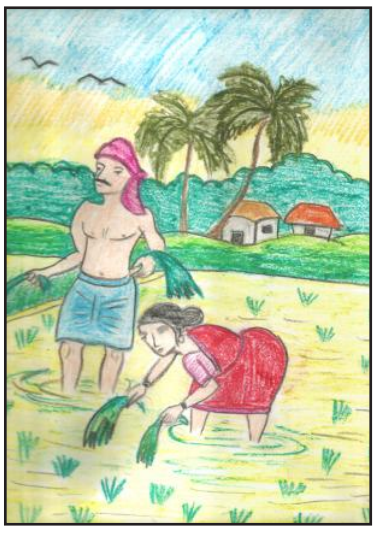

শর্মি ভট্টাচার্য্য
শ্রেণি - পঞ্চম,
উত্তরপাড়া দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন,
উত্তরপাড়া, হুগলি

ঐন্দ্রিলা রায়গোস্বামী
শ্রেণি - অষ্টম,
সেন্ট মার্গারেটস্ স্কুল, কলকাতা

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদত্ত কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com, সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন : ৯৮৩০০৭৭২০৫/৯৩৩০৮০৮৯০০, বিপণন : ৮০১৭১৫৫৪১৭ Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.